একটি পেরেকের কাহিনী

সাগরময় ঘোষ

এস্‌ গুপ্ত ব্রাদার্স (প্রাইভেট) লিমিটেড
৫৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

প্রকাশক—সুব্রত গুপ্ত
এস্. গুপ্ত ব্রাদার্স (প্রাইভেট) লিমিটেড
৫৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শিল্পী
পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রাকর—শ্রীগৌরহরি মাইতি
বাণী-মুদ্রণ
৯এ, মনমোহন বসু স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ – বৈশাখ, ১৩৭০
(গ্রন্থস্বত্ব গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত)
মূল্য ঃ—দুই টাকা মাত্র।

একটী পেরেকের কাহিনী

স্বীকৃতি

এই কাহিনী রচনার কৃতিত্ব যদি কিছু থাকে তা কথক বিশুদার প্রাপ্য, অকৃতিত্বটুকু লেখকের। বিধানচন্দ্রের জীবনের কিছু ঘটনা উদ্ধৃতির জন্য কয়েকটি সংবাদপত্র, বিশেষ করে 'দেশ' পত্রিকার 'সাংবাদিক'-এর কাছে লেখক ঋণী। ১৩৬৯ বঙ্গাব্দের শারদীয় 'জলসা'য় এ-কাহিনী প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ তারই পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপ।

উৎসর্গ

মা-কে

॥ এক ॥

উনিশ শ বাষট্টি সাল, পয়লা জুলাই।

পশ্চিমবাংলার বুকের উপর দিয়ে গত পনেরো বছর যে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে চলেছে সেই ঝড়ে বিরাট মহীরুহের অকস্মাৎ পতন ঘটল।

পয়লা জুলাই, রবিবার। সূর্য তখন মাথার উপর। নির্মেঘ নীলাকাশ। বিনা মেঘে বজ্রপাত যদিও হয় নি কিন্তু বিদ্যুতের চেয়েও সূক্ষ্ম এক অদৃশ্য শক্তিতরঙ্গে প্রচারিত একটি সংবাদে কলকাতা মহানগরী স্তম্ভিত।

নতুন বাংলার রূপকার কর্মযোগী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অপ্রত্যাশিত ভাবে মৃত্যুর কোলে চির বিশ্রাম নিলেন তাঁরই জন্মজয়ন্তী উৎসবের দিনে। তড়িতাহত হওয়ার মতই তীব্র অতর্কিত সে সংবাদের আঘাতে অসংখ্য সমস্যাপীড়িত দেশকে এক মুহূর্তে এক অখণ্ড সত্তায় বিচলিত হয়ে উঠতে দেখলাম। এই মহীরুহের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত ছিল আঘাত-সংঘাতে জর্জরিত পশ্চিম বাংলার সাড়ে তিন কোটি নরনারী। আজ তারা আশ্রয়হীন শোকবিহ্বল। তাদের নীরব ক্রন্দন আমি শুনেছি, আমি দেখেছি মহানগরীর উদ্বেল জনতাকে শান্ত হয়ে নম্র হয়ে তাদের মহানায়ককে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে।

পরদিন সকালে বিষণ্ণ ও ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে ডাঃ রায়ের কর্মজীবনের ঘটনাবলী ও আলোকচিত্র দেখতে দেখতে একটা চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরছে—এই অসাধারণ মানুষটির প্রতি আমার শেষ প্রণতি কী ভাবে নিবেদন করব। জনতার ভীড়ের সঙ্গে মিশে যেতে পারলে, তাদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারলেই আমি

তৃপ্তি পেতাম। কিন্তু ভীড় আমি চিরকাল ভয় করি। কোলাহল থেকে দূরে থাকাই আমার স্বভাব।

সেদিনের প্রায় সবগুলি দৈনিক সংবাদপত্র আমার সামনে খোলা। বাংলার এই মহানায়কের বিদায় দিনে প্রত্যেকটি কাগজের প্রথম পাতায় অষ্টকলমব্যাপী হেড লাইনে লেখা হয়েছে—

"নবীন বাংলার রূপকার বিধান চন্দ্রের তিরোধান"

"অমিতবীর্য প্রবীণতম মহানায়কের ত্যাগ ও কর্মদীপ্ত জীবনের অবসান…"

"জন্মদিন মৃত্যুদিন; একাসনে দোঁহে বসিয়াছে, দুই আলো মুখোমুখি মিলেছে জীবন প্রান্তে।"

তাঁর আবির্ভাব দিনেও এমনি 'হেড লাইন' নিয়েই তিনি এসেছিলেন। বাংলার রাজনৈতিক জীবনে প্রথম অবতীর্ণ হলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ১৯২৩ সালের পয়লা ডিসেম্বর।

আনন্দবাজার পত্রিকায় হেড লাইন বেরোলো ঃ

"নির্বাচনের ফলাফল
মন্ত্রীদের কেল্লাফতে
সুরেন্দ্রনাথ কুপোকাত…"

সারা ভারতের সংবাদপত্রেই সেদিন ডাক্তার বিধানচন্দ্র ছিলেন এক বিস্ময়কর শ্রেষ্ঠ সংবাদ। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠাব্যাপি বড় বড় অক্ষরে ছিল চারিটি লাইন ঃ

"Sir Surendranath Banerjee Defeated.
An object lesson to Supporters of Bureaucracy.
Dr Bidhanchandra Roy Elected
People's Victory in Barrackpore."

ব্যারাকপুরে স্বরাজ্য দল সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থী বিধানচন্দ্র সেদিন

যাঁকে পরাজিত করে প্রথম আইন সভায় প্রবেশ করেছিলেন তিনি ছিলেন বাংলার মুকুটহীন রাজা রাষ্ট্রগুরু স্যার সুরেন্দ্রনাথ।

রেডিওটা খোলা। ধারাবিবরণীর ঘোষক আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলে চলেছেন শোকযাত্রার মর্মস্পর্শী দৃশ্য। রাস্তায় রাস্তায় উত্তাল জনসমুদ্র, ফুলের তোড়া আর ফুলের মালায় শবাধারকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। বেতার ঘোষণায় বলা হল বেলা ১১টায় শবাধার রাসবিহারী অ্যাভিনিউর মোড়ে এসে পৌঁছবে। বাড়ির সবাই চলে গেছে। এক পরিচিত ভদ্রলোকের গাড়ি-বারান্দার ছাতে দাঁড়িয়ে তারা ডাঃ রায়কে শেষ দেখা দেখবে। একা বাড়িতে বসে খবরের কাগজের পাতাগুলির উপর চোখ বুলিয়ে চলেছি। বিদায় নেবার আগের দিনের একটি কৌতুককর ঘটনার বিবরণ বেরিয়েছে সংবাদপত্রে।

শনিবার রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু এসেছেন অসুস্থ মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে। তিনি বললেন—'কাল আপনার জন্মদিন, অনেক লোকের ভিড় হবে। আপনি কিন্তু কারও সঙ্গে দেখা করবেন না আবার।'

'—কেন?' কারণ জানতে চাইলেন বিধানচন্দ্র।

'—কারণ, স্বাস্থ্য।' রাজ্যপাল ধীরস্বরে জবাব দিলেন।

'—আপত্তি যদি স্বাস্থ্যগত কারণেই হয় তবে সম্ভবত আমি তোমার চেয়ে যোগ্যতর বিচারক। নয় কি?' ডাঃ রায় লঘুভাবে বিতর্কের উদ্বোধন করলেন। শ্রীমতী নাইডু জানেন, তর্কে ডাঃ রায়ের সঙ্গে পেরে ওঠা দায়। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ডাঃ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র সুবিমল রায়।

রাজ্যপাল অসহায়ের মত তার দিকে তাকালেন।

'—আপনি ত একজন মস্তবড় ব্যারিস্টার মিঃ রায়। আচ্ছা আপনিই বলুন এবিষয়ে আমাদের শাসনতন্ত্র কি বলে। কোনো রাজ্যের চীফ মিনিস্টার কি সে রাজ্যের গভর্নরের আদেশ অমান্য করতে পারেন?'

এবার হাল ছাড়তে বাধ্য হলেন ডাঃ রায়। হাসতে হাসতে বললেন—

'আচ্ছা, আচ্ছা তাই হবে। মাননীয় রাজ্যপাল যখন আদেশ করছেন—'

বিজয়িনী রাজ্যপালের দুই চোখ খুশিতে উজ্জ্বল।

একদিন এই খুশিই দেখা গিয়েছিল আমাদের রাজ্যপালের জননী স্বর্গতা সরোজিনী নাইডুর চোখে মুখে। তবে বিজয়ের গর্বে নয়, পরাজয়ের গৌরবে।

এলাহাবাদের 'আনন্দ ভবনে' অন্তরঙ্গদের আসর বসেছে। উপস্থিতদের মধ্যে আছেন গান্ধীজী, ডাঃ আনসারী, বিধানচন্দ্র এবং সরোজিনী নাইডু।

হঠাৎ সরোজিনী দেবী বলে উঠলেন—'ডাঃ রায়, বয়স ত আপনার পঞ্চাশে পৌঁছল। কিন্তু কী আশ্চর্য এখনও দেখছি হাসলে আপনার গালে টোল পড়ে।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন ডাঃ রায়—

'আর আপনি ত জানি পঞ্চাশ পেরিয়ে গিয়েছেন কিন্তু কী আশ্চর্য এ-সব আপনার নজর এড়ায় না!'

গান্ধীজী সেদিন হো হো শব্দে হেসে উঠেছিলেন।

এই ছোট্টো কৌতুককর ঘটনাটি পড়বার পরই মনে পড়ে গেল দূর অতীতের আর এক কাহিনী, সেদিনও মহাত্মা গান্ধী বিধানচন্দ্রের কথায় এই ভাবেই সশব্দে হেসে উঠেছিলেন।

গান্ধীজীর সঙ্গে বিধানচন্দ্রের প্রথম পরিচয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর তাঁর ভবানীপুরের বাড়িতে। তার আগে গান্ধীজীকে আরও দুবার তিনি দেখেছেন। একবার ১৯২৫ সালে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর বাসভবনে, আর একবার, তার পাঁচ বছর পরে, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে। কিন্তু সাক্ষাৎ পরিচয় সেই প্রথম। আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন বাসন্তী দেবী। সেইদিন থেকেই বিধানচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীর একজন একনিষ্ঠ অনুরক্ত শিষ্য হয়ে গেলেন। যখনই যেখানে গান্ধীজীর অসুস্থতার সংবাদ পেতেন সেখানেই তাঁর শয্যা পার্শ্বে আছেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

আগস্ট আন্দোলনের পরের কথা। গান্ধীজী তখন পুনায় আগা-খাঁর গৃহে বন্দী। ক'দিন আগে সবে তিনি তাঁর একুশ দিনের অনশনব্রত ভঙ্গ করেছেন। ডাঃ রায় সেবারেও তাঁকে দেখে গিয়েছেন। এবার নিজের কাজেই তিনি বোম্বাই এসেছিলেন, ভাবলেন একবার মহাত্মার সঙ্গে দেখা করে যাই।

কিন্তু বিধানচন্দ্রকে দেখে গান্ধীজী খুশি হলেও তাঁর চিকিৎসার প্রস্তাব শুনে মোটেই খুশি হলেন না। বললেন—

'ডাক্তার, তোমার চিকিৎসা ত আমি নিতে পারিনা।'

'—আমার অপরাধ?' জানতে চাইলেন বিস্মিত বিধানচন্দ্র।

'আমার দেশের চল্লিশ কোটি দীন দুঃখীর অসুখে যখন চিকিৎসা করতে পারনা, তখন আমিই বা তোমার চিকিৎসা কেন নেব?' সহজ সরল বিশ্বাস নিয়েই উত্তর দিলেন গান্ধীজী।

ডাঃ রায় বললেন—'ও, এই কথা! আমি চল্লিশ কোটি নর-নারীর চিকিৎসা করতে পারি না সত্য…কিন্তু এই চল্লিশ কোটি মানুষের আশা ভরসা যিনি, যিনি বাঁচলে চল্লিশ কোটি বাঁচবে—

তাঁর চিকিৎসারি ভার তারাই আমার হাতে তুলে দিয়েছে। সুতরাং আপনি আপত্তি করলেও আমি তা মানব কেন ?'

গান্ধীজীর মুখে এবার কৌতুকের হাসি দেখা দিল। তিনি বললে—

'আচ্ছা, তা না হয় হল। কিন্তু ডাক্তার, তোমার অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা আমি মেনে নিতে পারি না।'

তৎক্ষণাৎ ডাঃ রায় বললেন—'মহাত্মাজী, আপনিই না বলেন পৃথিবীর সব কিছু, এমন কি ধূলিকণাটি পর্যন্ত ঈশ্বরের সৃষ্টি।'

'নিশ্চয় ; এবং অন্তরের সঙ্গে এ-কথা আমি বিশ্বাস করি।' দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলেন গান্ধীজী।

এবারে বিধানচন্দ্রের পাল্টা জবানের পালা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন—

'তাহলে মহাত্মাজী অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাও কি তাঁর সৃষ্টি নয় ?'

এবার মহাত্মাজী হেসে বললেন—'তোমার উকিল-ব্যারিস্টার হওয়া উচিত ছিল ডাক্তার।'

সপ্রতিভ ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বললেন—'ভগবান তা না করে আমাকে চিকিৎসক করেছেন, কারণ তিনি জানতেন এমন একদিন আসবে যেদিন তাঁর সেরা ভক্ত মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধীর চিকিৎসার ভার আমার উপর পড়বে।'

হো হো শব্দে হেসে উঠলেন গান্ধীজী। বিধানচন্দ্রকে সস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে বললেন—'তোমার সঙ্গে পেরে ওঠা দায়। কি ওষুধ দেবে দাও খাই।'

কখন বেলা দশটা বেজে গিয়েছে টের পাইনি। আমার

বাড়ির ছোকরা চাকর কালিদাস বললে—'দাদাবাবু, আপনার কি বেরোতে দেরী হবে?'

'কেন বল তো?'

সঙ্কোচের সঙ্গে কালিদাস বললে—'আপনার যদি আপিসে বেরোতে দেরী থাকে আমি তাহলে ছুটে গিয়ে একবার ডাক্তারবাবুকে দেখে আসতাম। কোনোদিন তাঁকে দেখি নাই।'

অবাক বিস্ময়ে কালিদাসের মুখের দিকে তাকালাম। চব্বিশ পরগণার এক অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে কালিদাস। কলকাতা শহরে প্রথম এসে আমার বাড়িতেই কাজে লেগেছে আজ সাত-আট মাস হল। শহরের সে কিছুই জানে না, চেনে না। ডাঃ রায় কে ছিলেন, কিছুই তার জানবার কথা নয়। তবু তার দিকে তাকিয়ে মনে হল সে-ও যেন তার আপনজনকে হারিয়েছে! তার বিষণ্ণ মুখ আর ব্যথাতুর দৃষ্টি সেই স্বাক্ষর বহন করছে।

'আমার আপিসের জামাকাপড় গুছিয়ে দিয়ে তুই চলে যা। আমি পরেই বেরোবো।'

সম্মতি পেয়ে তাড়াহুড়োয় কাজ সেরেই কালিদাস ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল।

সংবাদ পত্রে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের কর্মময় জীবনের কত আলেখ্য, কত ঘটনা, কত কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে যার অনেক কিছুই সাধারণ মানুষের অজানা। প্রচার বিমুখ এই মানুষটি মুখ্যমন্ত্রী হবার আগে পর্যন্ত নিজেকে সর্বদাই নেপথ্যে রেখে ছিলেন। এতকাল তাই চিকিৎসাবিদরূপে তাঁর বিপুল সাফল্যই লোকে জেনেছে, তাঁর জীবনের কঠোর সংগ্রামের কথা অনেকেরই জানা ছিল না।

১৯০৪ সালের কথা। বিধানচন্দ্র তখন মেডিকেল কলেজে সবে

ভর্তি হয়েছেন। সেবার ছুটিতে ওঁরা কয় বন্ধু মিলে বেড়াতে গিয়েছেন বর্ধমানে। ফেরারপথে ট্রেনে উঠতে গিয়ে দেখেন ইণ্টার ক্লাস কামরায় যাত্রীরা সব দাঁড়িয়ে। কী ব্যাপার? এ সময়ে তো ভিড় হবার ত কথা নয়। ওঁরা দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলেন। ঢুকে দেখেন ভিড়ের কারণ এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান দম্পতী। স্বামী-স্ত্রী দুজনে দুটি বেঞ্চ দখল করে বসে আছেন, অন্যরা বসতে গেলেই অকথ্য কুকথ্য ভাষায় গালি গালাজ। তখন রেল কোম্পানীতে ছিল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের রাজত্ব, দাপটও ছিল প্রচণ্ড। বিধানচন্দ্র ও তাঁর বন্ধুরা ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুদের মধ্যে ইশারা হয়ে গেল। বসে পড়লেন সাহেব আর মেম সাহেবের পাশে। বলা বাহুল্য সাহেব আপত্তি জানালেন কিন্তু বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে মেডিকেল কলেজের সেই ছাত্রদের কাছে সাহেবকে পরাজয় স্বীকার করতেই হল। সবাইকে বসবার জায়গা দিতে বাধ্য হলেন। পরবর্তী জীবনে সেদিনের ঘটনা স্মরণ করে বিধানচন্দ্র বলতেন—সেদিন আমাদের কী আনন্দ, আমরা যেন ইংরেজ প্রভুদেরই হারিয়ে ফিরছি।

প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি যে এই ঘটনার পরেও পুরাদস্তুর সাহেব হবার বাসনায় বিধানচন্দ্র নিজেই নিজের নাম নিয়েছিলেন—'বেঞ্জামিন চার্লস রয়।'

কিন্তু বেঞ্জামিন চার্ল'স রয়কে বিধানচন্দ্র রায়ে ফিরে আসার ঘটনাটি আরো চমকপ্রদ। এম, বি, পরীক্ষার মাত্র দিন পনেরো বাকি। সকালে মেডিকেল কলেজের গেট-এ দাঁড়িয়ে আছেন বিধানচন্দ্র। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি দেখছেন ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক কর্নেল পেক্-এর ব্রুহাম গাড়িটা কলেজের দিকে আসছে। বেশ আসছিল, কিন্তু আচমকা মোড় ঘোরাতে গিয়ে কোচম্যান বিপত্তি ঘটাল। তখন সবে ঘোড়ার বদলে বৈদ্যুতিক ট্রাম চালু হয়েছে।

কর্নেল পেক্-এর গাড়ি ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে-চুরে একাকার হয়ে গেল। সৌভাগ্যবশত কর্নেল ও কোচম্যান দুজনেই অক্ষত অবস্থায় বেঁচে গেলেন। গাড়ি থেকে নেমেই সাহেব বিধানচন্দ্রকে সাক্ষী মানলেন '—আচ্ছা, তুমিই বল ট্রামটা কি ঘণ্টায় তিরিশ মাইল বেগে যাচ্ছিল না?'

'না'। উত্তর দিলেন বিধানচন্দ্র। তিনি বলিলেন—'আমার মতে দোষ আপনার কোচম্যানের স্যার, ট্রামের নয়।' সাহেব রাগে কাঁপতে কাঁপতে ভিতরে চলে গেলেন।

সাত দিন পর আবার ডাক পড়ল ছাত্র বিধানচন্দ্রের। কর্নেল পেক্ বললেন—'তোমাকে আদালতে সাক্ষী দিতে হবে।'

'দিতে পারি, তবে দুঃখের বিষয় আমার সাক্ষ্য আপনার পক্ষে যাবে না স্যার।' দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন ছাত্র বিধানচন্দ্র।

কর্নেল পেক অপমানে ও রাগে কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে বসে থেকে বললেন, 'আচ্ছা। তুমি যেতে পার।'

এই ঘটনার সাত দিন পরেই পরীক্ষা। লিখিত পরীক্ষা ভালোভাবেই চুকে গেল, এবার মৌখিক পরীক্ষার পালা। পরীক্ষা দেবার জন্য ঘরে ঢুকতেই দেখলেন কর্নেল পেক্ বসে। বিধানচন্দ্রকে দেখেই কর্নেল পেক্ ক্ষেপে গিয়ে চীৎকার করে উঠলেন—'গেট আউট, গেট আউট।' অবাধ্য ছাত্রের পরীক্ষা কিছুতেই তিনি নিলেন না। মাথা নীচু করে বেরিয়ে এলেন বিধানচন্দ্র। জীবন-সংগ্রামে সেইটিই তাঁর প্রথম ও শেষ পরাজয়।

বেলা এগারোটা বেজেছে। এবার আমাকে আপিসে বেরোতে হবে। রসা রোডে এসে দেখি ট্রাম-বাস বন্ধ, জনস্রোত বন্যার মত ছুটে চলেছে রাসবিহারী অ্যাভিনিউর দিকে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কিশোর

কিশোরী, দীনদরিদ্র সাধারণ মানুষ থেকে প্রাসাদোপম গৃহের যারা বাসিন্দা, যারা কদাচ পথচারীদের ভীড়ে নেমে আসেন, আজ তারাও সবাই রাস্তার মানুষদের সঙ্গে এক সত্তায় মিলিয়ে গিয়ে চলেছে উদগ্রীব আগ্রহে। সবারই চোখে নীরব প্রশ্ন, ভীড়ের মধ্যে কি তাঁকে একবার দেখতে পাবো?

সাদার্ন অ্যাভিনিউর মোড় পার হয়ে আমি আর এগোতে পারি নি। বিপুল জনতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর। বাড়ির ছাদ, কার্নিশ, বারান্দা, ফুটপাথ থেকে যানবাহন চলাচলের সদর রাস্তা সব ঢেকে গেছে কালো মাথায়। দুপুরের প্রচণ্ড কড়া রোদ উপেক্ষা করে লক্ষ লক্ষ নরনারী আজ পথে বেরিয়ে পড়েছে। কোনো ক্লেশ, কোনো ক্লান্তি, কোনো কষ্টই তারা গ্রাহ্য করছে না।

সাদার্ন অ্যাভিনিউর মোড়ে একটা গাছের ছায়ায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে শোকবিহ্বল জনতার মিছিল দেখছি আর ভাবছি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বটে, তিনি কোনোদিনই তথাকথিত জনতার নেতা ছিলেন না। কিন্তু তাঁর এই বিপুল জনপ্রিয়তার মূল কারণটি কি? কারণ বোধহয় তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব যা উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সম্পদ এবং যে-সম্পদ এই মানুষটির তিরোধানের সঙ্গে বাংলা দেশ থেকে লুপ্ত হয়ে গেল। রাজনীতিক নেতারূপে নয়, চিকিৎসাবিদ্‌রূপে এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষরূপে জীবদ্দশাতেই তিনি বাংলা দেশে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন। বিধানচন্দ্রের অনেক কাহিনীই আজ শুধু বাংলা দেশ নয়, ভারতবর্ষেরও ঘরে ঘরে প্রচলিত।

১৯১১ সালের জুলাই। বিধানচন্দ্র বিলাত থেকে যেদিন কলকাতায় পৌঁছলেন, তখন তাঁর পকেটে আছে মাত্র পঁচিশ টাকা। তা হোক, তবু তিনি ভারতের মাটিতে পা দেবার আগেই স্থির করে

বসে আছেন যে কোনও ওষুধের দোকানে বসে কমিশনের জন্য প্রেসক্রিপশন লিখবেন না। বিশেষ কারও অধীনে চাকরিও করবেন না। ধার দেনা করে তিনি ৮৪ নম্বর হ্যারিসন রোডের উপর একটি বাড়ি ভাড়া করে ফেললেন। তখন তাঁর তুই তুইটি বিলাতী ডিগ্রি—এম, আর, সি, পি, ও এফ, আর, সি, এস। সুতরাং ফী তু'টাকা থেকে বেড়ে হল আট টাকা।

এই অবস্থায় বেশ কয়েকমাস কেটে গেল। পসার তখনও ভালো করে জমে নি, আট টাকাকে ষোল টাকা করার অবস্থা তখনও হয়নি। একদিন এই কলকাতারই এক ধনী ব্যক্তি এসে বললেন—আপনাকে আমি আমার পারিবারিক চিকিৎসক নিযুক্ত করতে চাই। সেদিনও কলকাতার বনেদি ধনী পরিবারে বিলেত ফেরৎ গৃহ-চিকিৎসক রাখাটাও ছিল কৌলিন্যের অন্যতম মাপকাঠি।

বিধানচন্দ্র সেটা জানতেন বলেই উত্তর দিলেন—'মাপ করবেন। আমি কারও—'

আগেই বলেছি কলকাতার বনেদি বাবু-কালচারের ইনিও একজন বিশিষ্ট প্রতিভূ, তাই ছোকরা ডাক্তারের উদ্ধত জবাবে কিঞ্চিৎ মেজাজ দেখিয়েই বললেন—'জানেন কত পেতেন আপনি?'

'কত?' কৌতূহলী বিধানচন্দ্র লোকসানের পরিমাণটা শুনতে চান।

'বছরে দেড়শ টাকা।' ভদ্রলোক টাকার অঙ্কটা এমন ভঙ্গিতে বললেন যেন শুনেই ডাক্তারের চোখ ছানাবড়া হয়।

টাকার অঙ্ক শুনেই বিধানচন্দ্র প্রচণ্ড শব্দ করে হেসে উঠলেন।

'অর্থাৎ মাসে বারো টাকা? এমন দিনও ত হতে পারে আপনি একবারের ভিজিট বাবদই আমাকে দেড়শ' টাকা দিচ্ছেন।' হাসতে হাসতে কথাগুলি ছুঁড়ে মারলেন সেই গর্বান্ধ ধনীর মুখে।

রাগে গজরাতে লাগলেন তিনি, মুখ দিয়ে আর কথা বেরোলো না। কাঁপতে কাঁপতে গাড়িতে উঠে বসলেন।

এই ঘটনার কয়েকমাস পরেই হঠাৎ কাছাকাছি একটি বাড়ি থেকে 'কল' এল। এক ধনীর মেয়ে আফিম খেয়েছেন। বেলা তখন পাঁচটা। বিধানচন্দ্র তখনি ছুটলেন। পরদিন সকালে আবার তিনি রোগী দেখলেন। মেয়েটি তাঁরই চিকিৎসার গুণে সেরে উঠেছেন। কৃতজ্ঞতায় ধনী পিতার চোখে জল।

'কত ফী দেব ডাক্তার আপনাকে ?'

বিধানচন্দ্র এক মুহূর্ত ভাবলেন। তারপর বললেন—'এই বিশেষ কেসটিতে দেড়শ' টাকা পেলেই আমি খুশি।'

তক্ষুনি চেক লেখা হয়ে গেল। চেক্‌টি হাতে নেবার সময় ভদ্রলোকের চোখের দিকে তাকিয়ে বিধানচন্দ্র বললেন—'মনে পড়ছে আমাকে ? আমি সেই ডাক্তার যাকে আপনি বছরে দেড়শ টাকায় পুষতে চেয়েছিলেন।'

ডাঃ রায়ের চরিত্রের বজ্রকঠোর দিকটির পরিচয় এখানে দেওয়া হল কিন্তু অপর দিকটিও কুসুম-কোমল।

যাঁরা পয়সা দিতে পারতেন না বিধানচন্দ্র তাঁদের কাছে কোনোদিনও পয়সা নেন নি। কিন্তু যাঁদের দেবার ক্ষমতা আছে অথচ ভিজিট দিতে কার্পণ্য দেখান তাঁদের বলতেন—'চেম্বারে গিয়ে দিয়ে আসুন, সেখানে আমার 'পুওর বক্স' আছে।'

ভিড়ের চাপে আর এক পাও এগোনো সম্ভব নয়। রাসবিহারী আর আশুতোষ মুখার্জি রোডের মোড়ে কাতারে কাতারে লোক। ট্রামগাড়িগুলি দাঁড়িয়ে, তার ভিতরে আর ছাতে লোকে লোকারণ্য। মধ্য দিনের প্রচণ্ড রোদ মাথায় নিয়ে অধীর প্রতীক্ষায় তারা

দাঁড়িয়ে আছে, জনতার মধ্য থেকে আকুল আবেদন উঠছে—'জল ঢালুন, জল ঢালুন।' রাস্তার তুই পাশের বাড়ির ছাতে কার্নিশে বারান্দায় সমবেত মানুষদের কাছেই তাদের আবেদন। যে পারছে উপর থেকে বালতি বালতি জল ঢালছে রাস্তায় ফুটপাথে জমাট বাঁধা মানুষদের উপর।

আমি বিস্মিত হয়ে আবার ভাবছিলাম এই মানুষটির প্রতি জনতার এত শ্রদ্ধা ও ভালবাসার উৎসটি এতকাল কোথায় লুকিয়ে ছিল, আজ বাঁধভাঙ্গা বন্যার মত উত্তাল হয়ে যা ছড়িয়ে পড়ল মহানগরীর রাস্তায় রাস্তায়!

মনে পড়ে গেল বিধানচন্দ্র রায়ের জীবনের আরেকটি ঘটনা। বিলেত থেকে ফেরার পর বিধানচন্দ্র ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ ডিগ্রীর অধিকারী হলেও মাইনে তাঁর সব মিলিয়ে মাসে তিন শ তিরিশ টাকা। তা হোক। সরকারী হাসপাতালে কাজ, অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগবে। বিধানচন্দ্র চরিত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, যে-কাজে হাত দিতেন তাতেই সম্পূর্ণ ডুবে থাকতেন তিনি। এ-ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না।

কিছুদিন পরেই হঠাৎ ক্যাম্বেলের অধ্যক্ষ হয়ে এলেন ভারতীয় মেডিকেল সার্ভিসের সদস্য জনৈক মেজর রাইট। কদিন যেতে না যেতেই বিধানচন্দ্রের ডাক পড়ল তাঁর ঘরে। সাহেব বললেন—'কি কাজ করো তুমি এখানে?'

বিধানচন্দ্র তাঁর কাজের ফিরিস্তি দিলেন।

মেজর রাইট বলে উঠলেন—'আমার মনে হয় কাজের তুলনায় তুমি মাইনে একটু বেশী পাচ্ছ। নয় কি?'

'তা বটে।' উত্তর দিলেন বিধানচন্দ্র। 'একজন এম আর সি

পি (লণ্ডন) ; এফ আর সি এস (ইলণ্ড) এবং কলকাতার এম ডি বেতন পাচ্ছেন 'মাসে তিনশ' তিরিশ টাকা। কিন্তু অন্যজন এডিনবরার ফেলোশিপ ফেল করে পাচ্ছেন মাসে দেড় হাজার টাকা। সুতরাং প্রথম জনকে কিছু বেশিই দেওয়া হচ্ছে বই কি।'

মেজর রাইট সেই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তির আর কোনো জবাব খুঁজে পেলেন না। কারণ তিনি দেড় হাজার টাকার মাইনে পেলেও ফেলোশিপ ফেল করা ডাক্তার ।

ইংরেজের পদানত ভারতবাসীর সেদিন গ্লানির শেষ ছিল না। কিন্তু ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া। পরাধীন দেশের মানুষ হলেও আত্মমর্যাদা বোধ ছিল তাঁর অপরিসীম। তাঁর ঐ এক সংকল্প ছিল—'হতে পারি দীন তবু নহি মোরা হীন।' সাদা চামড়ার কাছে তাই কোনদিন তিনি নতি স্বীকার করেন নি, যতই দোর্দণ্ড প্রতাপ তার থাকুক। মেরুদণ্ড সোজা রেখেই তিনি আজীবন সমানে টক্কর দিয়ে এসেছেন তাদের সঙ্গে।

এই মেজর রাইট প্রসঙ্গেই আরেকটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন বিধানচন্দ্রের উপর। ফলে কদিনের মধ্যেই অধ্যক্ষ রাইটের কাছ থেকে নির্দেশ এল বিধানচন্দ্রের কাছে যে, ক্যাম্বেলের ফিজিওলজি বিষয়ের শিক্ষককে বেলা বারোটা থেকে তিনটে পর্যন্ত নিজের বিভাগে উপস্থিত থাকতে হবে। কেন না তাই নিয়ম। নতুন নির্দেশের সমর্থনে মেজর রাইট পঞ্চাশ বছর আগেকার একটি নোটিফিকেশনের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করেছেন।

চিঠিটা হাতে নিয়েই বিধানচন্দ্র অধ্যক্ষের ঘরে ঢুকলেন—'এ নির্দেশ কি আক্ষরিক অর্থেই পালন করতে হবে আমাকে ?'

'হ্যাঁ।' মেজর রাইটের কণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষ।

বিধানচন্দ্র বললেন—'না, অন্য রকমও হয় কি না, তাই বলছিলাম। আমরা যখন তৃতীয় শ্রেণীর ঠিকে গাড়ি ভাড়া করি তখন ভাড়া দিই ঘণ্টা হিসাবে, কিন্তু ট্যাকসির বেলা দিতে হয় দূরত্ব হিসেবে।'

মেজর রাইট ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন—'না, এক্ষেত্রে নির্দেশটা আক্ষরিক অর্থেই নিতে হবে।'

'আচ্ছা স্যার।' বিধানচন্দ্র তখনকার মত বিদায় নিলেন।

কদিন পরেই অধ্যক্ষের নতুন চিঠি। তিনি জানতে চেয়েছেন বিধানচন্দ্র বেলা চারটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত অন্য একটা ক্লাসের দায়িত্ব নিতে পারেন কিনা। ডাঃ রায় চিঠিটা পড়লেন, তারপর নিঃশব্দে সেটি ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। মাস খানেক পরে ফিজিওলজির ক্লাসে হঠাৎ মেজর রাইট উপস্থিত। '—তুমি তো এখনও আমার চিঠির উত্তর দিলে না ?'

'আপনার চিঠি !' বিধানচন্দ্র গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন—'সে তো সেদিনই ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি।'

'মানে !' গর্জন করে উঠলেন মেজর রাইট।

'মানে অতি স্পষ্ট। সরকারী কাজ যখন, তখন তা আমি আক্ষরিক অর্থেই করতে চাই। চাকরি আমার তিনটায় শেষ, নয় কি ?'

মেজর রাইট ঢোঁক গিললেন। কোন কথার জবাবে এই উত্তর, মেজর রাইটের তা বুঝতে বিলম্ব হল না।

এই মেজর রাইটের সঙ্গে ক্যাম্বেলেই আরেকটি ঘটনা। বাংলার গভর্নর ফ্রেজার সাহেব আসবেন হাসপাতাল পরিদর্শন করতে। মেজর রাইট হাসপাতালের অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মিদের নিয়ে সেজেগুজে গেট্-এ দাঁড়িয়ে আছেন গভর্নরকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে।

এমন সময় গাড়ি হাঁকিয়ে বিধানচন্দ্র সেখানে এসে হাজির।

গাড়ি থেকে নেমে কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ না করেই তিনি সোজা গিয়ে তাঁর বন্ধুর দলে মিশে গেলেন। কিন্তু মেজর রাইট-এর ধারণা ডাঃ রায় তাঁকে ইচ্ছে করেই অবজ্ঞা করেছেন।

হাসপাতাল পরিদর্শন হল, লাট সাহেব বিদায় নিলেন। পর-মুহূর্তেই ডাক পড়ল বিধানচন্দ্রের। ক্ষিপ্ত হয়ে মেজর রাইট বললেন—'তুমি যে তখন আমাকে দেখে টুপি খুললে না?'

বিনীত কণ্ঠে বিধানচন্দ্র বললেন—'আমি আপনাকে লক্ষ্য করিনি স্যার! লক্ষ্য করলেও টুপি খুলতাম না, শুধু বলতাম "গুড মরনিং।" কেননা ইংলণ্ডের আদব-কায়দায় এইটিই রীতি, নিজের চোখে দেখে এসেছি।'

উত্তপ্ত কণ্ঠে মেজর রাইট বললেন—'সেটা ইংলণ্ডের কথা, এটা ইণ্ডিয়া। নয় কি?'

বিধানচন্দ্র উত্তর দিলেন—'বেশ, আপনি সেই মর্মেই একটা লিখিত আদেশ জারী করুন, এবার থেকে টুপি খুলেই আপনাকে অভিবাদন জানাব।'

বলা বাহুল্য, রাইট এ প্রস্তাবে রাজি হন নি। তিনি বুঝেছিলেন যে এই নেটিভ ডাক্তারের মতলব হচ্ছে ওকে আরও হাস্যকর করে তোলা।

আর একবার মেজর রাইট লক্ষ্য করলেন যে ছাত্ররা তাঁকে দেখে শুধু 'গুড্ মরনিং' বলে দিব্য পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে, কেউ ছাতা বন্ধ করছে না। অথচ ক্যাম্বেলে তখন কড়া নিয়ম ছিল সামনে কোনো অধ্যাপক এলে তাঁকে সম্মান দেখাবার জন্যে ছাতা বন্ধ করতেই হবে কিন্তু বিস্মিত হয়ে তিনি কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছেন যে তাঁকে দেখে ত নয়ই কোনো অধ্যাপককে সামনে দেখে ছাত্ররা ছাতা বন্ধ করছে না।

ছাত্রদের ডাক পড়ল অধ্যক্ষের আপিস-ঘরে। হম্বিতম্বি করার পরই জানা গেল এই বিদ্রোহের নায়ক বিধানচন্দ্র। বিধানচন্দ্রকে ডেকে পাঠিয়ে মেজর রাইট জানতে চাইলেন যে, অধ্যাপক হয়ে ডিসিপ্লিন না মানবার জন্যে ছাত্রদের উস্কানি দেবার অর্থ কি।

উত্তরে বিধানচন্দ্র মেজর রাইটকে জানিয়ে দিলেন যে ওটাকে ডিসিপ্লিন বলে না, ওটা একটা বিরক্তিকর প্রথা।

মেজর রাইট আর কথা বাড়ালেন না, অপমানটা হজম করেই গেলেন। এতদিনে তিনি বিধানচরিত্রের খানিকট আঁচ পেয়ে গিয়েছিলেন, বুঝেছিলেন এ মেরুদণ্ডকে নত করা ওর সাধ্য নয়।

ইংরেজ চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, পরাজিত হলেও বিপক্ষের মহত্ত্বকে স্বীকৃতি জানাতে সে কার্পণ্য করে না। মেজর রাইটও তাই করেছিলেন। অবসর নেবার সময় আসবার বেশ কয়েক বছর আগেই তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। শুধু তাই নয়, যাবার আগে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে ডেকে পাঠিয়ে সস্নেহে হ্যাণ্ডশেক্ করে বলেছিলেন—

'আমি অসময়ে কেন অবসর নিচ্ছি জান? আমি জানি এই প্রতিষ্ঠানে আমার চেয়ে বহুগুণ বেশি যোগ্য শিক্ষক থাকতে আমার পক্ষে একাজ করা অনুচিত।'

সহসা আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে রব উঠল—'ঐ আসছেন, ঐ এসে গেছেন।'

মুহূর্তের মধ্যে ছড়ানো ছিটানো বিক্ষিপ্ত জনতা চৌমাথার উপর মৌচাকের মত জমাট বেঁধে গেল। আমি তখনো সাদার্ন এভেনিউর মোড়ের মেহগিনির গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে বিস্মিত হয়ে ভাবছিলাম যে খাঁটি মানুষকে চিনতে জনতা ভুল করে নি। নইলে, বেশ-ভূষা

আচারে ব্যবহারে যিনি একান্ত সহজ সরল অনাড়ম্বর ছিলেন, রাজনীতির প্রকাশ্য-মঞ্চে সস্তা হাততালি কুড়োবার কোন ভূমিকা যিনি কখনো নেননি, দেশ-মাতৃকার সেই নীরব সাধকের প্রতি অলক্ষ্যে সঞ্চিত এত শ্রদ্ধা প্রীতি অনুরাগ সহসা স্বতোৎসারিত প্রস্রবণের মতো উদ্বেল হয়ে উঠল কী করে!

হঠাৎ দেখি আমার সামনে বিশুদা দাঁড়িয়ে। আমাদের পত্রিকা আপিসের শনিবারের আড্ডার সেই বিখ্যাত না-লিখে-সাহিত্যিক বিশুদা। চেহারা দেখে প্রথমে আমি চিনতেই পারিনি। অবিন্যস্ত চুল, গালভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গরমে ঘামে গায়ের গেরুয়া পাঞ্জাবী ভিজে শপ শপ করছে, মুখে থমথমে গাম্ভীর্য। বিশুদার এ চেহারা আমি কোনোদিন দেখিনি।

বিশুষ্কমুখ বিশুদা আমাকে গম্ভীর হয়ে বললেন—'চলুন আপনার বাড়ি। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই, কিছুই দেখতে পাবেন না।'

বিস্মিত হয়ে বললাম—'কিন্তু আপনি এখানে? আর এ কী চেহারা হয়েছে আপনার—'

আরো গম্ভীর গলায় বিশুদা বললেন—'সব বলছি, আগে চলুন আপনার বাড়ি।'

আপিস যাওয়া হল না। বিশুদাকে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

সারা পথ বিশুদা নীরব, একটি কথাও বললেন না। বসবার ঘরে ঢুকেই তাকিয়াটা মাথায় দিয়ে খাটের উপর ধপাস করে শুয়ে পড়লেন। চোখ দুটি বন্ধ, মুখে কোনো কথা নেই।

বিশুদা হঠাৎ শোকে এতটা মুহ্যমান হয়ে পড়বেন আমি তা ভাবতেও পারিনি। ব্যাঙ্কে সামান্য বেতনে কেরানীর চাকরি করেন বিশুদা, বৃহৎ সংসার নিয়ে দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁর নিত্য সংগ্রাম। তবু বিশুদার বিষণ্ণ মুখ কোনদিন আমি দেখিনি।

বিশুদা তখনো চোখ বুজে চুপচাপ শুয়ে আছেন। এই অসহনীয় নীরবতা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আমি বললাম 'বিশুদা, এক কাপ চা খাবেন ?'

বিশুদা এবার চোখ খুললেন। খাটের উপর উঠে বসে বললেন—'না, চা খাবো না। এক গেলাস জল দিন।'

এক গেলাস জল এনে দিতেই নিমেষে তা নিঃশেষ করে বললেন—'আরেক গেলাস দিন, বড় তেষ্টা পেয়েছিল।'

আরেক গেলাস জল খেয়ে বিশুদা এবার ধাতস্থ হলেন। তাকিয়াটার উপর ক্লান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে বললেন—'টালিগঞ্জে গিয়েছিলাম বৈদ্যনাথের সঙ্গে দেখা করতে, দেখা পেলাম না। কাল দুপুর থেকেই সে ডাঃ রায়ের বাড়িতে পড়ে ছিল, রাত্রেও বাড়ি ফেরেনি, এখনও না। বোধহয় প্রসেশনের সঙ্গেই ও আছে।'

কে এই বৈদ্যনাথ ! এর কথা বিশুদার মুখে কোনদিন শুনিনি। তাছাড়া আজকের দিনের ঘটনার সঙ্গে বৈদ্যনাথের সম্পর্কই বা কি। আমার চিন্তার জাল ছিন্ন করে বিশুদা আবার বললেন—'বৈদ্যনাথের ছেলেমেয়ে তিনটে আমাকে দেখেই কেঁদে আকুল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বলছে—কাকাবাবু, আমাদের আপনি নিয়ে চলুন, দাদুকে শেষ বারের মত একবার দেখব।'

আমার মুখে কোনো প্রশ্ন নেই, বৈদ্যনাথ সম্পর্কে অপার বিস্ময় নিয়ে বসে আছি।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বিশুদা বললেন—'বৈদ্যনাথের মা কাল থেকে জল পর্যন্ত মুখে দেননি, কেঁদে কেঁদে শয্যা নিয়েছেন। ওর স্ত্রী পাথরের মত ঘরের এক কোণায় স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল, আমাকে দেখেই পাগলের মতো চীৎকার করে কান্না! কোথায় গেলাম

বৈদ্যনাথকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে আসব কিন্তু কী পরিস্থিতির মধ্যেই গিয়ে পড়লাম বলুন ত।'

বৈদ্যনাথ ও তার পরিবার আমার কাছে বিরাট রহস্য হয়ে দেখা দিল। কৌতূহল আর চেপে রাখতে না পেরে বৈদ্যনাথের পরিচয় জানবার জন্যে উৎসুক হয়ে বিশুদাকে প্রশ্ন করতেই যে কাহিনী সেদিন বিশুদা আমাকে শুনিয়েছিলেন তা যেমন বিস্ময়কর তেমনি মর্মস্পর্শী। বিশুদার জবানীতেই সে-কাহিনী আপনাদের কাছে উপস্থিত করলাম।

॥ দুই ॥

ছেলেবেলায় বেশ কিছুকাল আমাকে পূর্ববঙ্গে চাঁদপুর শহরে কাটাতে হয়েছিল। কাজের উপলক্ষ্যে বাবাকে প্রায়ই চাঁদপুর যেতে হত, মাঝে মাঝে আমিও যেতাম। চাঁদপুরে পুরান বাজারে আমার এক দূর সম্পর্কের পিসি থাকতেন, তাঁর কাছে আমাকে রেখে বাবা বেরিয়ে পড়তেন গ্রাম থেকে গ্রামে আদায়পত্তরের কাজে। ওখানে সঙ্গী সাথী বড় একটা কেউ আমার ছিল না। আমি পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার গ্রামের ছেলে, তাই স্বাভাবিক সংকোচবশতই সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গ আমি এড়িয়ে চলতাম। যে পাড়ায় থাকতাম সেই পাড়ারই কয়েকটা বাড়ির পরে থাকত বৈদ্যনাথ। মায়ের একমাত্র সন্তান, সে-ও আমারই মত নিঃসঙ্গ। তার একটা কারণও ছিল। বৈদ্যনাথের জন্মের পর ওর বাবা স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়। নিঃসহায় নিঃসম্বল মা একমাত্র পুত্র বৈদ্যনাথকে বুকে করে আশ্রয় নিলেন ভাইয়ের বাড়িতে। উদয়াস্ত পরিশ্রম, তবু লাঞ্ছনার শেষ নেই। জ্ঞান হওয়া অবধি মায়ের নীরব চোখের জল শুধু দেখেছে বৈদ্যনাথ, কিন্তু কারোর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করতে কখনো শোনেনি।

বৈদ্যনাথ ইস্কুলে যেত আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে। গায়ে তালি দেওয়া ইজের-কামিজ, কিন্তু তার জন্য কোনো সংকোচ ওর ছিল না। তেজী ও তাজা ঘোড়ার বাচ্চার মতন ছুটতে ছুটতে ও স্কুলে যেত, আবার ছুটতে ছুটতেই ফিরত।

এক শনিবার দুপুরে স্কুল থেকে ফিরছে, রাস্তায় ওকে ধরলাম।

'ভাই, চাঁদপুর স্টীমারঘাটে আমার বড় বেড়াতে যাবার ইচ্ছে কিন্তু পিসিমা আমাকে একা যেতে দিতে চান না। তুমি আমাকে নিয়ে যাবে?'

আমার অনুরোধ তাকে বেশ কিছুটা অবাক করে দিল। আমাকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে বললে—'তুমি কলকাতা থেকে এসেছ?'

'না ঠিক কলকাতা নয়, এসেছি বর্ধমান থেকে। তবে কলকাতা হয়ে যাওয়া আসা করতে হয়।'

রাজী হয়ে গেল বৈদ্যনাথ। বললে, 'আমি একবার মাকে বলে এক্ষুনি আসছি।'

ছুটে চলে গেল বৈদ্যনাথ। পিসিমাকে কথাটা বলতেই খুশি হয়ে বললেন—'বৈদ্যনাথ বড় ভাল ছেলে। ওর মায়ের দুঃখের শেষ নেই, কিন্তু এই ছেলের মুখ চেয়ে নীরবে সব সহ্য করছে।'

কিছুক্ষণ পরেই বৈদ্যনাথ এল। পিসিমা সস্নেহে মুড়ি-নারকোল খেতে দিলেন, বৈদ্যনাথ কিছুতেই খাবে না। অনেক সাধ্যসাধনার পর দুজনে একসঙ্গে খেলাম, কিন্তু এটা যে ওর মনঃপূত নয় তা বুঝতে বিলম্ব হয়নি।

রাস্তায় চলতে চলতে কলকাতা সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করে গেল বৈদ্যনাথ। ওর ছোটো মামা থাকে কলকাতায়। পূজোর ছুটিতে যখন বাড়ি আসেন তখন তার কথাবার্তা, চালচলন, সাজপোশাক দেখে বৈদ্যনাথ ধারণা করে নিয়েছে যে কলকাতায় গেলেই অনেক টাকা রোজগার করা যায়, বড়লোক হওয়া যায়, আর বড়লোক হতে পারলে বাড়িতে আদর যত্ন খাতির সম্মান তার বেশি।

ওর ছেলেমানুষী নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে দুজনে স্টীমারঘাটায় যখন এসে পৌঁছলাম তখন

বিকেল হয়েছে। মেঘনা নদীর কূল দেখা যায় না, সমুদ্রের মতই বিশাল। দূরে মাঝনদীতে স্টীমার চলে যাচ্ছে, বৈদ্যনাথ সেই দিকেই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

মেঘনা নদীর বুকে সোনার আলো ছড়িয়ে সূর্য অস্ত যেতেই আমরা উঠে পড়লাম। ফেরার পথেও বৈদ্যনাথ কলকাতা সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করল, জানবার কৌতূহল তার অসীম। বৈদ্যনাথের সঙ্গে সেদিন আমার প্রথম পরিচয়, সে-পরিচয় অচিরে গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হল। সেদিন থেকে বৈদ্যনাথই ছিল আমার নিত্যসঙ্গী।

মাস দুই পর চাঁদপুরে আদায়পত্তরের কাজ শেষ করে বাবা চলে এলেন নিজেদের গ্রামে। বিদায় দেবার জন্যে স্টীমারঘাট পর্যন্ত এসেছিল বৈদ্যনাথ। যতক্ষণ স্টীমার দেখা যায় সে জেটী থেকে এক পাও নড়েনি।

॥ তিন ॥

চাঁদপুর থেকে চলে আসার পর বৈদ্যনাথের সঙ্গে দীর্ঘকাল আর আমার কোনো যোগাযোগ ছিল না। গ্রামের ইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় এসে কলেজে ভর্তি হয়েছি। বাবা তখন থাকতেন কালীঘাটে, একখানি মাত্র ঘর। মা, আমরা দুই ভাই আর এক বোন এই নিয়ে আমাদের সংসার। বাবার সামান্য রোজগার, সেই রোজগারের সন্ধানে বছরের বেশিভাগ সময় বাইরে বাইরেই তাঁকে কাটাতে হয়।

দীর্ঘ কালের অদর্শনে আমার কৈশোরকালের ক্ষণিকের বন্ধু বৈদ্যনাথের কথা মন থেকে প্রায় মুছেই গিয়েছিল। হঠাৎ মার কাছে চাঁদপুরের পিসিমার এক চিঠি এসে হাজির। পিসিমা জানিয়েছেন, অর্থের অভাবে বৈদ্যনাথ ম্যাট্রিক পাশ করে ঘরে বসে আছে, কুমিল্লায় কলেজে পড়াবার মত অবস্থা ওর মায়ের নয়। ভাইয়ের বাড়িতে গলগ্রহ হয়ে আছে, তাতে লাঞ্ছনার শেষ নেই। বৈদ্যনাথ কলকাতায় এসে যে-কোনো উপায়ে একটা চাকরি খুঁজে নিতে চায়। পিসিমা তাই অনুরোধ জানিয়েছেন, যতদিন না একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পারছে ততদিন কলকাতায় আমাদের বাসায় একটু মাথা গুঁজবার জায়গা যেন ওকে দিই।

পিসিমার চিঠি পড়ে কিশোর বালক বৈদ্যনাথের ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা ও শত অপমানের মধ্যেও তার তেজোদ্দীপ্ত রূপটি ভোলার নয়। একগুঁয়ে ও অভিমানী সে ছিল, কিন্তু আত্মমর্যাদাবোধ ছিল তার অপরিসীম।

বৈদ্যনাথের সঙ্গে আবার দেখা হবে এই আশায় মার হয়ে আমিই চিঠি লিখে দিলাম পিসিমাকে। জানিয়ে দিলাম, বৈদ্যনাথকে অবিলম্বে কলকাতায় আমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে। মা শুধু একবার চিন্তিত হয়ে বলেছিলেন—'একখানা মাত্র ঘর, তার উপর তোরা এতজন। থাকার জায়গা কি করে হবে রে?'

আমি বললাম—'তার জন্যে ভেবো না মা। খুব অসুবিধা হলে অন্য ব্যবস্থা করা যাবে। এখন ত চলে আসুক।'

চিঠি পাঠাবার দিন সাত পরেই এক সন্ধ্যায় বৈদ্যনাথ এসে হাজির। চেহারা বদলে গেছে। কিশোর বালক এখন তরুণ যুবা। চোখ দুটি আরো শান্ত কিন্তু আরো উজ্জ্বল। এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও মুখের দীপ্তি কিছুমাত্র কমেনি। একটা ছোট্টো টিনের তোরঙ্গ, দু-এক জোড়া জামাকাপড় শুধু আছে। বিছানাপত্র কিছুই নেই আমাদের একটিমাত্র ঘর এবং এতজন মানুষ দেখে বৈদ্যনাথ আগেই স্থির করে নিয়েছিল যে ঘরের কোণায় টেবিলটার তলায় খবরের কাগজ পেতেই ও শোবে, বিছানার কোনো প্রয়োজন নেই। ও একবার যা স্থির করেছে তা থেকে এক চুল নড়ানো কারো সাধ্যি নেই, আমি তা জানতাম। অনেক সাধ্য-সাধনার পর মা শুধু ওকে একটা ছোটো মাথার বালিশ ব্যবহার করতে রাজী করাতে পেরেছিলেন, তার বেশি আর কিছুই নয়।

পরদিন সকাল থেকেই শুরু হয়ে গেল বৈদ্যনাথের প্রাণপাত পরিশ্রম চাকরির সন্ধানে। সকালে বেলা আটটার মধ্যেই দুটি ডাল-ভাত কোনোরকমে মুখে দিয়েই ও বেরিয়ে পড়ে, ফেরে সন্ধ্যার পর। সম্ভব-অসম্ভব নানা জায়গায় ঘোরাঘুরির পর এক দোকানে খাতা লেখার কাজ পেল, পনেরো টাকা মাইনে। তিন মাস কাজ করার পর দশটা টাকা ছুঁইয়ে দোকানের মালিক বললে, বাজার

খুবই মন্দা। আপাতত এর বেশি আর কিছুই দিতে পারছে না। রাগ করে কাজ ছেড়ে দিল বৈদ্যনাথ। কিন্তু টাকাটা সে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিল, প্রথম রোজগারের টাকা। আমার কাছ থেকে নানা আপিসের ঠিকানা সংগ্রহ করে আবার শুরু হল তার পথপরিক্রমা। সেই সকালে বেরিয়ে যায়, রাত্রে ফেরে। অধিকাংশ দিনই রাত্রে সে বাড়িতে খেত না, বলত বাইরেই খেয়ে নিয়েছে। আমি ভালভাবেই জানতাম বৈদ্যনাথ একবেলা অনাহারেই থাকত। ততদিনে ওর চরিত্র আমার জানা হয়ে গিয়েছে। এ-সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে হয়ত ও আমার বাড়ি ছেড়ে ট্রাম ডিপোর গুমটিতে গিয়ে আশ্রয় নেবে। তবু একদিন না বলে পারিনি, মার পীড়াপীড়িতেই বলতে হল।

সেদিন রাত্রে শ্রান্ত ক্লান্ত বৈদ্যনাথ বাড়ি ফিরেই মুখহাত ধুয়ে টেবিলের তলায় শুতে যাবে, আমি বাধা দিলাম।

'বৈদ্যনাথ, বেশ বুঝতে পারছি তোমার রাত্রে কিছু খাওয়া হয়নি। আমাদের সঙ্গে খাবে চলো। না খেলে আমরাও কেউ খাব না।'

বৈদ্যনাথ স্তব্ধ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। চোখের দীপ্তি আরো প্রখর, আরো তীব্র। প্রচণ্ড বদরাগী আর একগুঁয়ে আমি তা জানতাম। ওর দারিদ্র্যের প্রতি কেউ যদি ইঙ্গিত করে বা ওর আত্মমর্যাদায় যদি কেউ ঘা দেয় কখনও সে তা সহ্য করবে না। ওর চোখ-মুখের ভাব দেখে মনে হল বোধহয় সে এই মুহূর্তেই আমাদের ঘর ছেড়ে চলে যাবে। ওর কিছু বলবার বা করবার আগেই ওকে শান্ত করবার জন্যে বললাম—'সারাদিন তুমি এতো ঘোরাঘুরি করো, পরিশ্রম করো, তাতে তোমার শরীর ভেঙ্গে পড়েছে তা কি তুমি বোঝো না? তার উপর যদি এইভাবে একবেলা না খেয়ে কাটাও একটা শক্ত অসুখে পড়তে কতক্ষণ।

আমি তোমার স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখেই কথাটা বলেছি, আর কিছুর জন্যে নয়।'

মাথা নীচু করে কী যেন ভাবল বৈদ্যনাথ। তারপর আস্তে থেমে বললে—'কলকাতায় আমার আর এক মামা থাকেন। সওদাগরী আপিসে পঁচাত্তর টাকা মাইনের চাকরি করেন। তাছাড়া আরো দু-চারজন আত্মীয় যে কলকাতায় নেই তা নয়। কিন্তু কোনো আত্মীয়ের আশ্রয়ে আর আমি থাকতে চাই না বলেই তোমার কাছে এসেছি।'

ওর মনের মধ্যে নিরন্তর একটা জ্বালা তুষের আগুনের মত জ্বলছে, আজ তা প্রকাশ হয়ে পড়ল। চাঁদপুরে মামার বাড়িতে ওর মায়ের গলগ্রহ হয়ে থাকার নির্যাতন ও মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারছে না। এর পরে আর কোনোদিন খাওয়া নিয়ে পীড়াপীড়ি করিনি। রাত্রে বাড়ি ফিরে কোনদিন ও নিজেই মার কাছে চেয়ে খেত, কোনদিন খেত না।

দু-চারদিন ঘোরাঘুরির পরেই বৈদ্যনাথের একটা চাকরি জুটে গেল। ধর্মতলা স্ট্রীটের এক ওষুধের ল্যাবরেটরিতে, মাইনে কুড়ি টাকা। কালীঘাট থেকে রোজ হেঁটে ধর্মতলায় যায়, রোজ হেঁটে আসে। মাস গেলে সম্পূর্ণ মাইনেটি সে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেয়। তার এই কঠোর পরিশ্রমের একমাত্র পরিতৃপ্তি সেইখানে।

একদিন কৌতূহলবশত আমি বললাম—'আচ্ছা বৈদ্যনাথ, তুমি যে এতটা দীর্ঘ পথ হেঁটে যাও আর হেঁটে ফের, কোনদিন ক্লান্তি বোধ হয় না?'

সে বললে—'জানো বিশ্বনাথ, আমি স্বপ্ন দেখতে দেখতে চলি। পথক্লেশ তাই আমি টের পাইনে।'

অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম—'স্বপ্ন মানে ?'

'মানে অতি সরল।' আমি কল্পনা করতে করতে পথ চলি কবে মামার মত পঁচাত্তর টাকা মাইনে আমার হবে।'

এত দুঃখকষ্ট আর বিপর্যয়ের মধ্যে দিন কাটিয়েও বৈদ্যনাথ তার মায়ের দুঃখ ঘোচাবার কঠিন সংকল্প থেকে আজও বিচ্যুত নয়।

একদিন সন্ধ্যায় বাড়ির রোয়াকে বসে আছি, দূর থেকে দেখতে পেলাম বৈদ্যনাথ আসছে, কিন্তু হাঁটছে খুঁড়িয়ে। কাছে আসতেই বললাম—'তুমি খুঁড়িয়ে হাঁটছো কেন ? পায়ে কোনো চোট লেগেছে নাকি ?'

'এমন কিছু না। চটি জুতোর একটা পেরেক কদিন ধরে গোড়ালির তলায় খোঁচা দিচ্ছিল। ইঁট ঠুকে চালিয়ে নিচ্ছিলাম। আজ সকালে কাজে যাবার সময় অনেক ঠোকাঠুকি করেও পেরেকটাকে বাগ মানাতে পারিনি। থেকে থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।'

শংকিত হয়ে বললাম, 'কাজটা ভালো করোনি বৈদ্যনাথ। একজোড়া চটি কিনে নিলেই ত পার। ওটা পুরোনো হয়ে গেছে, মুচি দিয়ে মেরামত করেও কাজ চালাতে পারবে বলে মনে হয় না।'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বৈদ্যনাথ বললে—'কালই কিনব মনে করেছি।'

রাত্রে কিছু না খেয়েই বৈদ্যনাথ শুয়ে পড়ল। একটা অসোয়াস্তিতে সারারাত ও ছটফট করেছে, ঘুমোতে পারেনি। তবু একবারও আমাদের ডেকে কিছুই বলেনি।

প্রতিদিন সকালে সবার আগেই বৈদ্যনাথ ঘুম থেকে ওঠে। ব্যতিক্রম ঘটল পরের দিন সকালে। টেবিলের তলায় কুঁকড়ে শুয়ে আছে বৈদ্যনাথ। কোনো হুঁশ নেই। গায়ে হাত দিয়ে দেখি

প্রবল জ্বর, চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল। বৈদ্যনাথ ঘোরের মধ্যে একবার শুধু বললে, পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা।

ছুটে চলে গেলাম পাড়ার এক পরিচিত ডাক্তারের কাছে। বৈদ্যনাথকে পরীক্ষা করেই ডাক্তার বললে—'ওকে এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যান, বাড়িতে রেখে এ-রোগের চিকিৎসা হবার উপায় নেই।'

বিস্মিত হয়ে বললাম—'এমন কি হয়েছে যে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে?'

'পায়ে পচন ধরেছে।'

ডাক্তারের কথা শুনে একটা আসন্ন বিপদের কালো ছায়া আমার চোখের উপর নেমে এল। আমি ঘাবড়ে গেলাম। সুদূর চাঁদপুরে এক নিঃসহায় বিধবা তার একমাত্র পুত্রকে আমাদের ভরসায় পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন। যদি কিছু অঘটন ঘটে যায় তাঁর কাছে কী জবাবদিহি দেব। আমার যা অবস্থা, তাতে বাড়িতে রেখে বড় ডাক্তার দেখিয়ে বৈদ্যনাথের চিকিৎসা করা একেবারেই অসম্ভব। পাড়ায় আমার এক বন্ধু আছে। নাম তার ভোলা। বিপদে আপদে পাড়ার প্রত্যেক বাসীন্দার সে একমাত্র বল ভরসা।

বিপদের কথা শুনেই ভোলা বললে—'ডাক্তার যখন বলেছে তখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই উচিত।'

'—কিন্তু—'

'এর মধ্যে আর 'কিন্তু' থাকতে পারে না। তুই তৈরী হয়ে নে। আমি এখুনি ট্যাক্সি নিয়ে আসছি।'

সেই মুহূর্তেই ভোলাকে সঙ্গে নিয়ে বৈদ্যনাথকে ধরাধরি করে ট্যাক্সিতে চাপিয়ে প্রথমেই নিয়ে গেলাম শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাস-

পাতালে। রুগী দেখেই হাসপাতালের ডাক্তার বললেন—'গ্যাংগ্রিন হলে এখুনি সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে ভর্তি করে নিতাম। কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে টিটেনাস ইনফেকশনও হয়েছে। এ-রোগের চিকিৎসা শম্ভুনাথে হবার উপায় নেই, ওকে ক্যাম্বেল কিম্বা কারমাইকেলে এখুনি নিয়ে যান।'

পাড়ার ডাক্তার শুধু নয়, হাসপাতালের হাউস ফিজিশিয়ান পর্যন্ত যখন এ-কথা বললেন তখন আর সন্দেহ রইল না যে বৈদ্যনাথকে নিয়ে এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখে আমরা উপস্থিত। দিশাহারা অবস্থায় আমি বেঞ্চির উপর বসে পড়েছি, কিছু ভাববার বা করবার মত মনের জোর পর্যন্ত তখন আমার হারিয়েছে।

আমার অবস্থা দেখে ভোলা প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললে—'দেখ বিশে, এখানে বসে হা-হুতাশ করলেই কি বৈদ্যনাথ বাঁচবে? চল, আর এক মুহূর্ত দেরী করা চলবে না। উঠে পড়।'

বৈদ্যনাথকে আবার ধরাধরি করে ট্যাক্সিতে তোলা হল। এখন আমাদের গন্তব্যস্থল কোথায়? ক্যাম্বেল, না কারমাইকেল। ক্যাম্বেল যখন কাছে পড়ছে তখন সেখানে যাওয়াই আমি স্থির করলাম।

ভোলা বললে—'তা হবে না। ক্যাম্বেলে শুনেছি রুগী ঢুকলে আর জ্যান্ত ফেরত আসে না, পোস্টমর্টমের পর ডাক পড়ে রুগী ফেরত নেবার জন্যে। দেরি হয় হোক, তবু কারমাইকেলেই চল।'

বেলগাছিয়া ট্রামডিপোর কাছে কারমাইকেল কলেজ, এখন যার নাম হয়েছে আর, জি, কর মেডিকেল কলেজ, সেদিকেই ট্যাক্সি ছুটল তীর বেগে। পিছনের সিট-এ ভোলার কোলে মাথা রেখে বৈদ্যনাথ অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে। ড্রাইভারের পাশে আমি, আমার অবস্থাও প্রায় বৈদ্যনাথের মতো। কোন কথা বলবার শক্তিও যেন আমার ফুরিয়ে গিয়েছে।

কারমাইকেলে আমরা যখন উপস্থিত হয়েছি বেলা তখন এগারোটা। এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে রুগী নিয়ে উপস্থিত হওয়া মাত্র হাউস ফিজিশিয়ান সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা করেই বৈদ্যনাথকে পাঠিয়ে দিলেন সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে। গম্ভীর গলায় আমাদের বললেন—'বড় দেরি করে ফেলেছেন আপনারা। খুবই সিরিয়স্ কেস্, দেখি কী করা যায়। আপনারা যাবেন না, বাইরে অপেক্ষা করুন।'

বৈদ্যনাথের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। জানি না ওর ভাগ্যে কী আছে। আক্ষেপ থেকে গেল যাবার আগে ওকে দুটো সান্ত্বনার কথা, ভরসার কথাও বলতে পারলাম না। বলবার মত মনের অবস্থা আমার ছিলই না, শুনবার মত অবস্থা কি ওর ছিল?

তখনকার দিনে কারমাইকেল কলেজের রুগী এক-একদিন এক-একজন ডাক্তারের ওয়ার্ডে ভর্তি হবার রীতি ছিল। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তখন কারমাইকেলের ফিজিওল্মজির প্রধান শিক্ষক, তাছাড়া প্রতিদিন সকালে একবার করে এসে তাঁর ওয়ার্ডের রুগীদের পরীক্ষা করে যেতেন।

ডাঃ রায়ের ছিল 'এ' ওয়ার্ড। প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার তাঁর ওয়ার্ডে রুগী ভর্তি হত। ডাঃ পি, নন্দীর ছিল 'বি' ওয়ার্ড, বাকি তিন দিন রুগী ভর্তি হত তাঁর ওয়ার্ডে।

কারমাইকেল কলেজের চত্বরে একটা নিম গাছের ছায়ায় আমি ও ভোলা অনিশ্চিত আশংকা নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। থেকে থেকে স্টেথ্স্কোপ গলায় ঝোলানো সাদা অ্যাপ্রন পরিহিত কাউকে দেখলেই বৈদ্যনাথের খবর জিজ্ঞাসা করি, সঠিক উত্তর মেলে না।

বেলা বারোটা বেজে গিয়েছে। বৈদ্যনাথ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হবার মত কোনো হদিস পাচ্ছি না। ভোলাকে কথাটা বলতেই সে ধমকে উঠল—'তুই থাম দেখি। বৈদ্যনাথের একটা কিছু খবর না নিয়ে

আমাদের যাওয়া উচিত হবে না। তাছাড়া ডাক্তার যখন আমাদের অপেক্ষা করতে বলেছেন।'

হঠাৎ নজরে পড়ল সেই হাউস ফিজিশিয়ানকে। যিনি প্রথম বৈদ্যনাথকে পরীক্ষা করেছিলেন তিনি আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছেন। আমাদের ডেকে বললেন—'আপনাদের আর মিছামিছি অপেক্ষা করিয়ে রাখতে চাই না।'

আমার মুখে কোন কথা নেই। ভোলা বললে—'তা কি হয় স্যার? বাড়ি ফিরেই বা নিশ্চিন্ত হই কি করে। আমাদের অপেক্ষা করতে কোনো আপত্তি নেই।'

ডাক্তার বললেন—'তা তো বুঝলাম। কিন্তু ডাঃ রায় ত এখনো হাসপাতালে এলেন না। আজ বুধবার, আজ ওঁর ভিজিট করার দিন।'

ডাক্তার রায়ের নাম শুনেই আমার ঝিমিয়ে পড়া মন যেন নিমেষে চাঙ্গা হয়ে উঠল। নিজের উৎসুক্য চেপে রাখতে না পেরে বললাম—'ওঁর কি আসবার সময় পার হয়ে গিয়েছে?'

'ডাক্তার রায়ের কোনো বাঁধাধরা টাইম নেই। তবে সাধারণত বেলা দশটা থেকে বারোটার মধ্যেই ওয়ার্ড ভিজিট করতে আসেন। আজ যখন বারোটা বেজে গিয়েছে তখন কখন আসবেন তার কোনো স্থিরতা নেই।'

আমি কাতরভাবে বললাম—'ডাক্তার রায় না এলে কি বৈদ্যনাথের কোনো ট্রিটমেণ্ট হবে না?'

হাউস ফিজিশিয়ান এবার হেসে ফেললেন। বললেন—'এসব কেস্-এ কি রুগী ফেলে রাখা চলে? ইন্‌জেকশন্ যা দেবার তা দিয়েছি। কঠিন সার্জিক্যাল কেস্। অ্যানেসথেশিয়া রুগী সহ্য করতে পারবে কি না, সেটুকু ডাক্তার রায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির

করে নেওয়া দরকার ছিল। ডাক্তার রায় এসে পড়েন ত ভালই। অপারেশন আমাদের আজই করে ফেলতে হবে। বিকেল চারটের পর এসে খোঁজ নেবেন।'

এ কথা বলেই ডাক্তার যেমন তড়িঘড়ি এসেছিলেন তেমনি ব্যস্ত হয়েই চলে গেলেন। মনে মনে জেনে গেলাম যে একটা কঠিন পরীক্ষার ভিতর দিয়ে বৈদ্যনাথকে পার হতে হবে, সেইসঙ্গে আমাকেও। আরো আধঘণ্টা সময় গাছতলায় আমরা দাঁড়িয়ে। ফিরে যাবো কিনা সেই কথাই তখন ভাবছি।

সহসা হর্ন বাজিয়ে একটি গাড়ি গেটের ভিতর ঢুকিল । গাড়ি থেকে স্টেথস্‌কোপ হাতে নামলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। সাধারণত ডাক্তার রায় ওয়ার্ড ভিজিট করতে এলে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট থেকে শুরু করে হাউস ফিজিশিয়ান অ্যাসিস্টেণ্ট সবাই ভিড় করে ডাক্তার রায়ের সঙ্গে ওয়ার্ডে ঢুকতেন। কারণ প্রত্যেক রুগী সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তার সঠিক উত্তর না পেলে ডাক্তার রায় ভীষণ বকাবকি করতেন এবং কেউই রেহাই পেতেন না।

সেদিন বোধহয় সবাই ধরে নিয়েছিল ডাঃ রায় আর আসছেন না। গাড়ি থেকে নেমে ডাঃ রায় প্রতিদিনের অভ্যাসমত আর জি করের স্ট্যাচুর সামনে এসে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়ালেন। তারপর নিঃশব্দে ঢুকে গেলেন বাঁ দিকের একতলায় অ্যালবার্ট ভিকটর ওয়ার্ডে।

হঠাৎ ভোলা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বললে—'দ্যাখ বিশে, এই সুযোগ। এমার্জেন্সি ওয়ার্ডের সেই ডাক্তারকে তো দেখছি না। আমরা গিয়ে ডাক্তার রায়কে বৈদ্যনাথের কথাটা বলি।'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই ভোলা আমাকে টানতে টানতে 'এ' ওয়ার্ডে গিয়ে ঢুকে পড়ল। ওয়ার্ডে ঢুকে দেখি ডাক্তার রায়

একা প্রত্যেক রুগীর মুখের দিকে একবার করে তাকিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন, দু-একজনকে শুধু ছোট্টো প্রশ্ন—'কেমন বোধ করছ।'

ওয়ার্ডের অপর প্রান্তে, একটা বেড ঘিরে একদল ছাত্র। ডাঃ রায়েরই এক অ্যাসিস্টেন্ট লেকচারার রুগী সম্পর্কে ছাত্রদের কী যেন বোঝাচ্ছেন। ডাঃ রায় সোজা সেখানে গিয়ে উপস্থিত। ছাত্ররা ওঁকে দেখেই দুপাশে সরে দাঁড়াল। রুগীর কাছে এসেই ডাঃ রায় ভারী গলায় প্রশ্ন করলেন—'কী হে, কী ব্যাপার। এখানে এত জটলা কিসের।'

অ্যাসিস্টেন্ট লেকচারার বললেন—'স্যার, এটা সিরিয়স্ কেস্, নিউমোনিয়া বলেই বোধ হচ্ছে। অক্সিজেন দিতে বলেছিলাম, দেওয়া হচ্ছেও। কেস্‌টা একটু পিকিউলিয়র বলেই ছাত্রদের ওয়াচ্ করতে বলছিলাম।'

ডাক্তার রায় রুগীর আরো খানিকটা কাছে এসে বললেন—'নিউমোনিয়া বলে বোধ হচ্ছে? তা নিউমোনিয়া হল কেন?'

এ প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই এবং ডাঃ রায় কোনো উত্তর আশাও করেননি। অভ্যাসমত দুই হাত পিছনে আবদ্ধ রেখে রুগীর মুখের দিকে দেখলেন। রুগী তখন শিবনেত্র হয়ে পড়ে আছে, নাকে অক্সিজেনের নল গোঁজা। ঠোঁট দুটো খোলা, খাবি খাচ্ছে। ছাত্ররা তখন রুগীর চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে। ডাঃ রায় রুগীর বুকে টোকা দিলেন, ফুলে-ওঠা পেট্‌টাও বাজিয়ে দেখলেন। পরমুহূর্তেই বললেন—'নিউমোনিয়া ঠিকই। তবে আমাশা থেকে ওর লিভার খারাপ হয়ে অ্যামেবিক অ্যাবসেস্ হয়েছে। ট্যাপ করে পুঁজ বার করে দাও, ভালো হয়ে যাবে।'

অ্যাসিস্টেন্ট লেকচারার একথা শুনে থতমত খেয়ে গেল।

ছাত্ররাও হতবাক্। লেকচারার বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন—'তাহলে স্যার…'

কোনো কিছু মন্তব্য না করে ডাক্তার রায় গট্ গট্ করে চলে গেলেন। লেকচারারের প্রশ্ন আর শেষ হতে পারল না। পরে জানা গিয়েছিল যে, রুগীর পেট ট্যাপ করে প্রায় এক পিণ্ট পুঁজ বার করা হয়েছিল এবং রুগী বেঁচেও উঠেছিল।

ইতিমধ্যে হাসপাতালময় রাষ্ট্র হয়ে গেছে ডাক্তার রায় ভিজিটে এসেছেন। যে যেখানে ছিল হন্তদন্ত হয়ে সবাই ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। হাউস ফিজিশিয়ান, অ্যাসিস্টেণ্ট দু-জন, স্টাফ নার্স এমন কি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পর্যন্ত। ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে লম্বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রুগীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন, আমরা দুজন গুটিগুটি সেই ভিড়ের একপাশে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ দেখা গেল সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের সেই হাউস ফিজিশিয়ান হন্তদন্ত হয়ে আসছেন। তাঁকে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম যে বৈদ্যনাথের কথা বলবার জন্যেই আসছেন। ডাঃ রায়কে বলামাত্রই তিনি বললেন—'চলো, একবার ওকে দেখে আসি।'

সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে যাবার পথে রুগী সম্পর্কে হাউস ফিজিশিয়ানের কাছে যা কিছু জানবার জেনে নিয়ে বৈদ্যনাথের কাছে এসে দাঁড়ালেন ডাক্তার রায়। অভ্যাস মতো আবার দুই হাত পিছনে আবদ্ধ রেখে বৈদ্যনাথের চোখ আর মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে দেখলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন—'তা হলে পা-টা অ্যাম্পুট করাই তোমরা স্থির করলে?'

'হ্যাঁ স্যার, কিন্তু অ্যানেসথেটিক স্ট্যাণ্ড করতে পারবে না বলেই আমাদের সকলের ধারণা। আপনি কী পরামর্শ দেন।'

তখনো এক দৃষ্টিতে বৈদ্যনাথের রোগযন্ত্রনাক্লিষ্ট মুখের দিকে

তাকিয়ে ডাক্তার রায়। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন—'অ্যানেস্থেটিক হয়তো স্ট্যাণ্ড করতে পারবে। কিন্তু কথা হচ্ছে, এই উনিশ কুড়ি বছরের ছেলের পা-টা গেলে ও দাঁড়াবে কার জোরে ?'

এ-কথা বলেই ডাক্তার রায় বৈদ্যনাথের একেবারে কাছে এগিয়ে এসে একটা হাত ধরে বললেন—'তুমি একটু উঠে দাঁড়াতে পারবে ? আমার হাত ধরেই ওঠো।'

অসহ্য যন্ত্রণা নিয়েই বৈদ্যনাথ ডাঃ রায়ের হাতে ভর দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

ডাঃ রায় বললেন—'জোড়পায়ে দাঁড়াও আর হাত দুটি একত্র করে সামনের দিকে প্রসারিত করে দাও তালু দুটো চিৎ করে।'

অঞ্জলি দেওয়ার মত বৈদ্যনাথ দাঁড়াল। পকেট থেকে কলমটা বার করে ডাঃ রায় বৈদ্যনাথের হাতের চেটোর উপর বোলাতে লাগলেন, মাঝে মাঝে ঠুকেও দেখলেন। তারপর বললেন—'কোনো সেনসেশন বোধ করছ ? শির শির করছে ?'

বৈদ্যনাথ বললে—'না, সে রকম কিছু বোধ করছি না। তবে পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা।'

'ঠিক আছে। শুয়ে পড়।'

বৈদ্যনাথ বিছানায় শুয়ে পড়তেই মাথার তালুতে দু-চার বার থাবড়া মেরে ডাঃ রায় বললেন—'এবার ?'

বৈদ্যনাথ ঘাড় নেড়ে জানালে, এবারেও সে কিছু বোধ করছে না।

বৈদ্যনাথকে আর কিছু প্রশ্ন না করে ডাঃ রায় হাউস ফিজিশিয়ানকে বললেন—'টিটেনাস ইনফেকশন হয় নি। মনে

হচ্ছে রোগটা পেরিফেরাল নিউরাইটিস। ওকে অবিলম্বে আমার ওয়ার্ডে বদলি করে দাও।'

হাউস ফিজশিয়ানের কাছ থেকে একটা প্যাড নিয়ে প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন ডাঃ রায়, সেই সঙ্গে যা-যা করণীয় তাও বলে সোজা গাড়িতে উঠে বসলেন।

॥ চার ॥

সাড়ে তিন মাস বৈদ্যনাথকে থাকতে হয়েছিল এই হাসপাতালে। এই সাড়ে তিন মাস হাসপাতালের জীবন বৈদ্যনাথকে আরেক মানুষে রূপান্তরিত করেছিল। ওয়ার্ডের প্রত্যেক রুগী থেকে শুরু করে সুপারিটেণ্ডেন্ট, হাউস ফিজিশিয়ান, স্টাফ নার্স, ওয়ার্ড মাষ্টার, ওয়ার্ড বয় সবার মায়ামমতা স্নেহযত্ন অকুণ্ঠ এবং অযাচিত ভাবে পেয়ে নিঃসঙ্গ বৈদ্যনাথ মানুষের মাঝে বেঁচে থাকার আর এক নতুন আস্বাদ পেয়ে ধন্য হল। তার একটা কারণও ছিল। ডাঃ রায় প্রতিদিন ওয়ার্ডে এসে বৈদ্যনাথের কাছে বেশি সময় কাটাতেন এবং শুশ্রূষার কোনরকম ত্রুটি যাতে না হয় সে-বিষয়ে সবাইকে সচেতন করে দিতেন। সবাই জানত এই রুগীর প্রতি ডাঃ রায়ের একটু বিশেষ দুর্বলতা আছে এবং সেই কারণেই সুপারিটেণ্ডেন্ট থেকে ওয়ার্ড বয় সবাই বৈদ্যনাথের বিশেষ যত্ন নিত।

হাসপাতালে যে লোকটি রুগীদের খাবার তদারক করে সে বয়সে বৃদ্ধ, বহুদিনের পুরোনো লোক। তার কাজ হচ্ছে, খাবার দেবার সময় রুগীদের সঙ্গে হেসে দু-চারটি মিষ্টি কথা বলা, আহার বিমুখ রুগীকে অনুরোধে উপরোধে কিছু খাওয়ানো। একদিন সে খাবার দিতে এসে বৈদ্যনাথকে বললে—'তুমিতো বেঁচে গেলে ভাই। হাসপাতালের ডাক্তাররা তোমাকে দেখে যে-রোগ ঠাওরেছিল তাতে একটা পা অ্যামপুট করতে হত আর তা না করলেও পা-টা চিরকালের মত পঙ্গু হয়ে যেত। ডাঃ রায়ের নজরে পড়েছিলে বলেই আজ আবার আগের মত সুস্থ সবল হয়ে উঠলে। তুমি তো ভাগ্যবান।'

পরের দিন ডাঃ রায় রুগী পরীক্ষা করতে এসে বৈদ্যনাথকে দেখেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বললেন—'এ ছেলেটিকে তোমরা এখনো হাসপাতালে আটকে রেখেছ কেন? ওকে ছুটি দিয়ে দাও।'

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মাথা চুলকে বললেন—'আমরা তো ওকে ছুটি দিয়েছি কিন্তু ও যেতে চাইছে না স্যার।'

অবাক হয়ে ডাঃ রায় বললেন—'যেতে চাইছে না মানে? একটা বেড অকারণে তোমরা আটকে রাখবে?'

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিরুত্তর। ডাঃ রায় আর কোনো কথা না বলে অন্য রুগীর দিকে এগিয়ে গেলেন। যেতে যেতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বললেন—'তবে ওকে বলে দিও, যে-ল্যাবরেটরিতে ও কাজ করত সেখানে যেন ডিউটি বদলে নেয়। ওর পক্ষে দাঁড়িয়ে ল্যাবরেটরির কাজ করা আর উচিত হবে না।'

ডাঃ রায় রুগী দেখে চলে যেতেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বৈদ্যনাথের কাছে এসে বললেন—'শুনলে তো ডাঃ রায়ের কথা। এবার তাহলে তোমাকে বেড খালি করে দিতে হয়। ডাঃ রায় ফের যদি তোমাকে এখানে দেখেন তা হলে আমাদের উপর ভীষণ বকাবকি করবেন।'

আকাশ ভেঙ্গে পড়ল বৈদ্যনাথের মাথায়। সে ভালো করেই জানে ওর চাকরি আর নেই। নতুন চাকরিতে ঢুকেই যার চার মাস কামাই হয় তার চাকরি থাকার কোনো সম্ভাবনাই নেই। এই হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আবার ওকে মহানগরীর পাষাণ দেয়ালে দিনের পর দিন মাথা খুঁড়ে মরতে হবে চাকরির চেষ্টায়।

বৈদ্যনাথকে চিন্তান্বিত ও বিমর্ষ দেখে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সহানুভূতির সঙ্গে বললেন—'তোমার এত চিন্তা করবার কি আছে। স্বয়ং চিন্তামণি যখন তোমার উপর প্রসন্ন তখন তাঁর এক কথায়

তোমার একটি চাকরি ত আমাদের এই হাসপাতালেই অনায়াসে হয়ে যেতে পারে। অনেক রকমের কাজই ত এখানে আছে।'

কথাটা বৈদ্যনাথের খুবই মনে ধরল। এই হাসপাতালের খাওয়াদাওয়া যেরকম ভালো আর স্টাফদের সঙ্গে ওর যে সম্পর্ক এই চার মাসে গড়ে উঠেছে তাতে হাসপাতাল ছেড়ে চলে যেতে ওর কষ্ট হবে বৈকি। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বৈদ্যনাথকে পরামর্শ দিলেন ডাঃ রায়কে নিজের মুখে বলতে। তবে হাসপাতালে রুগী দেখতে আসবার সময় বলে লাভ হবে না। ওয়ার্ড ভিজিট করার সময় রোগ-সংক্রান্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথা কখনই বলেন না, পছন্দও করেন না। সুতরাং সকালবেলা ন'টার মধ্যে ওঁর বাড়ি গিয়ে দেখা করাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট উপায়।

বৈদ্যনাথ মুহূর্তের মধ্যে ওর কর্তব্য স্থির করে ফেললে। পরদিন সকালে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সোজা চলে গেল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ডাঃ রায়ের বাড়ি। ঢুকতে গিয়েই কোলাপসেবল্ গেট-এর কাছে দারোয়ান আটকালে।

'কেয়া মাঙ্গতা?'

'ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'ছিলিপ লাগাও।' একটা পেনসিল আর ভিজিটরস্ স্লিপ দারোয়ান সামনে এগিয়ে দিল। বৈদ্যনাথ ইংরিজিতে লিখল—'Baidyanath Bose of Carmichael Hospital.'

স্লিপ ভিতরে চলে গেল, কিন্তু ডাক আর আসে না। গেট-এর সামনের ফুটপাথে অধৈর্য হয়ে পায়চারি করতে লাগল বৈদ্যনাথ। ন'টা বাজতেই ডাক্তার রায় বেরিয়ে গেলেন, দেখা আর হল না। পরের দিন আবার গেল বৈদ্যনাথ, আবার স্লিপ লিখল, ডাক এল

না। সেদিনও যথারীতি কাঁটায় কাঁটায় ন'টা বাজতেই বেরিয়ে গেলেন।

বৈদ্যনাথ বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগল। ডাক্তার রায় দিনের পর দিন তাকে সযত্নে দেখেছেন, সস্নেহে কথা বলেছেন, অথচ আজ তিনি তাকে এ-ভাবে উপেক্ষা করলেন কেন! গোলমালটা হয়েছিল অন্যত্র। ভিজিটরস্ স্লিপ-এ 'বিজনেস' বলে যে-কথাটা লেখা থাকে সেখানে বৈদ্যনাথ কিছুই লেখেনি, লিখবেই বা কি করে! 'চাকুরী-প্রার্থী' কথাটা কি লেখা যায়? ওটা মুখেই বলা চলে। কিন্তু ঐটেই হয়েছিল কাল। দারোয়ান স্লিপ নিয়ে ডাঃ রায়ের এসিস্টেন্ট-এর হাতে দেয়, 'বিজ্‌নেস্'-এর অংশ ফাঁকা দেখে সে-স্লিপ চাপাই থাকে। এতটা তো আর বৈদ্যনাথের জানবার কথা নয়।

ডাঃ রায়ের তখন নিয়ম ছিল প্রতিদিন সকালে বাড়িতে রুগী দেখা।

পরদিন সকালে ডাঃ রায় যখন বাড়িতে রুগী দেখছেন সেই সময়ে এল বৈদ্যনাথ। আজ সে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এসেছে, যে-করে হোক দেখা করবেই। গেট-এর দারোয়ান কী একটা কাজে অন্যত্র গিয়েছে, সেই ফাঁকে ঢুকে পড়ল বৈদ্যনাথ। যে-ঘরে রুগীরা বসে আছে সেই ঘরেরই এক কোণায় শেষ বেঞ্চিতে সে বসে পড়ল। ডাঃ রায় একে একে সামনের বেঞ্চির রুগীদের পর পর ডাকছেন, পরীক্ষা করছেন, প্রেসক্রিপশন লিখে দিচ্ছেন।

অবশেষে বৈদ্যনাথের পালা। ডাঃ রায় কী একটা মনোযোগ সহকারে লিখছিলেন, বৈদ্যনাথকে ভাল করে লক্ষ করেননি। রুগী ভেবেই বৈদ্যনাথকে ডেকেছিলেন, বৈদ্যনাথও দুরু দুরু বক্ষে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

লিখতে লিখতে ডাঃ রায় বললেন—'কই, কাগজপত্র দেখি।'

বৈদ্যনাথ নিরুত্তর।

ডাঃ রায় লেখা থামিয়ে রুগীর মুখের দিকে তাকিয়েই অবাক।

'সে কি, তুমি এখানে কেন? তোমার ত রোগ সেরে গিয়েছে।'

বৈদ্যনাথ দ্বিরুক্তি না করে অসংকোচে বলল—'আপনি আমাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়েছেন বটে কিন্তু আমি কোথায় যাব, কোথায় থাকব? আমার ত চাকরিও নেই।'

গম্ভীর হয়ে ডাক্তার রায় বললেন—'আমার কাজ রুগীর চিকিৎসা করা। কারো চাকরি করে দেওয়া আমার কাজ নয়।'

বৈদ্যনাথ তখন মরিয়া হয়ে গেছে। বলল—'আমাকে যদি একটা চাকরী না দেন তাহলে আমার মা না খেতে পেয়ে মরবে, আমি না খেতে পেয়ে মরব।'

টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন ডাঃ রায়। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন—'চাকরির খোঁজে আমার কাছে কেন? আরও তো অনেক লোক আছে শহরে। তাদের কাছে চেষ্টা করো।'

তখনো ডাঃ রায়ের পিছন ছাড়েনি বৈদ্যনাথ। সে বললে—'কলকাতায় এসে ছ'মাস আমি পরিচিত অপরিচিত বহু লোকের সঙ্গে দেখা করেছি। বহু আপিসে উমেদারী করেছি। চাকরি পাইনি। শেষকালে ওষুধের ল্যাবরেটরিতে কুড়িটাকা মাইনের কাজ পেয়েছিলাম, তা-ও আমার ভাগ্যে সইল না। কাল সেখানে খোঁজ নিতে গিয়ে শুনি আমার জায়গায় অন্য লোক নেওয়া হয়েছে, বাড়তি লোক রাখার মত ক্ষমতা ওদের নেই। আপনি আমার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন, আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ

নেই। তবু আপনাকে চাকরির কথা বলতে এসে বিরক্ত করছি এই জন্যে যে, আপনার কাছেই শেষ চেষ্টা করে দেখব। যদি ব্যর্থ হই আত্মহত্যা করা ছাড়া আর আমার কোনো উপায় নেই।'

একটা কাঁপা উত্তেজনায় এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে বৈদ্যনাথ থামল। ডাঃ রায় ততক্ষণে লিফ্‌টের কাছে এসে গিয়েছেন। লিফ্‌টম্যান দরজা খুলে তাঁরই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। লিফ্‌টে উঠতে গিয়েও কী ভেবে ডাঃ রায় উঠলেন না। বৈদ্যনাথের মুখের দিকে একবার তাকালেন, যেমনভাবে রুগীর মুখের দিকে তাকান রোগ নির্ণয়ের আগে।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে ডাঃ রায় কি একটা চিন্তা করে বললেন—'কলকাতায় তোমার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই?'

'আছে। কিন্তু তাদের কাছে হাত পাততে যাব না।' কথাটা দৃঢ়ভাবেই বলল বৈদ্যনাথ।

'বুঝেছি। তা আমার কাছে তুমি কী চাকরি চাও আর কী কাজই বা তুমি করতে পারবে?'

'হাসপাতালের যে-কোনো কাজে যদি আমায় লাগিয়ে দেন।'

অবাক হয়ে ডাঃ রায় বললেন—'হাসপাতালের কাজ? ট্রেনিং ছাড়া ওখানকার কোনো কাজই তুমি পারবে না।'

বৈদ্যনাথ বুঝতে পেরেছে ডুববার আগে একটা শক্ত খুঁটির আশ্রয় বুঝি পেল। দৃঢ়তার সঙ্গে সে বললে—'আমার যোগ্যতা কি আছে না আছে তা আপনি ভালই জানেন। তবে এটুকু আমি বলতে পারি, যে-কাজই আপনি আমাকে দিন প্রাণপাত পরিশ্রমে আমি নিজেকে তার যোগ্য করে নেবই।'

লিফ্‌টে চড়ে উপরে না গিয়ে আবার রুগী-দেখার ঘরে ফিরে এলেন ডাঃ রায়। টেবিল থেকে একটা প্যাড তুলে কী সব লিখে

কাগজটা বৈদ্যনাথের হাতে দিয়ে শুধু বললেন—'সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট-এর সঙ্গে এই চিঠি নিয়ে দেখা কর।'

ডাঃ রায় লিফ্‌টে চড়ে উপরে উঠে গেলেন। তাঁর হাতের লেখা কাগজটা মুঠো করে ধরে রইল বৈদ্যনাথ। বহু আকাঙ্ক্ষিত অমূল্য বস্তু তার হাতের মুঠোয়। এতদিন পরে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার এক অনাস্বাদিত আনন্দে সে অভিভূত হয়ে পড়েছে। অনেক দুঃখের দিন বৈদ্যনাথের জীবনে এসেছে, কোনোদিন চোখের জল সে ফেলেনি। আজ তার দুই চোখ জলে ভরে এল।

॥ পাঁচ ॥

ডাঃ রায়ের চিঠি নিয়ে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট-এর সঙ্গে দেখা করতেই সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যনাথের চাকরি হয়ে গেল। ওয়ার্ড অ্যাসিস্টেণ্ট, কুড়ি টাকা মাইনে। হাসপাতালেই থাকার জায়গা পেয়ে গেল, খাওয়াটা ফ্রি। ডাঃ রায় হাসপাতালে ভিজিট করতে এলে দূর থেকে বৈদ্যনাথ দুই হাত তুলে নমস্কার জানায়। কোনোদিন নজরে পড়ে, কোনোদিন পড়েও না। অ্যাসিস্টেণ্ট পরিবৃত হয়ে রুগী দেখায় এত ব্যস্ত থাকেন যে এগিয়ে গিয়ে কথা বলার সুযোগ বড় একটা হয় না। কথা বলবার আর আছেই বা কী। যা চেয়েছিল তাকে ত তা দিয়েছেন। শুধু কৃতজ্ঞতা জানানো? সে ত মনে মনে দিবারাত্রই সে জানাচ্ছে।

দিন সাতেক কাজ করার পর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বৈদ্যনাথকে ডেকে বললেন—'ট্রেনিং-এর জন্যে তোমাকে ত একটা কোর্স নিতে হবে। কাল থেকেই তা শুরু হচ্ছে, তুমি ভর্তি হয়ে যাও। তিন মাসের এই ট্রেনিং কোর্সটা না নেওয়া থাকলে তোমার কাজের যোগ্যতাই প্রমাণিত হবে না, উন্নতিও করতে পারবে না।'

বৈদ্যনাথের হাতে একটা ফর্ম দিয়ে আবার বললেন—'এইটে ভর্তি করে আনো আর সেই সঙ্গে দু'জন ডাক্তারের রেকমেণ্ডেশন দরকার। তবে তুমি যদি ডাঃ রায়ের একটা সই এই ফর্মে করিয়ে আনতে পার তা হলে আর কারো স্বাক্ষরের প্রয়োজন হবে না।'

পরদিন সকালে ফর্মটা হাতে করে আবার সে গেল ডাঃ রায়ের

বাড়ি। আবার সেই এক কথা—'ছিলিপ লাগাও।' বৈদ্যনাথ জানে স্লিপ দিলেও তার ডাক আসবে না। সুতরাং সে ফুটপাথেই পায়চারি শুরু করে দিল।

ন'টা বাজতেই ডাঃ রায় বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠতে যাবেন, এমন সময় বৈদ্যনাথ সামনে এসে হাজির। ওকে দেখেই ডাঃ রায় বললেন—'তুমি এখানে কেন? আবার কী হল।'

তাড়াতাড়ি ফর্মটা এগিয়ে দিয়ে বললে—'একটা সই করে দিন স্যার।'

সেদিকে লক্ষ্য না করে এবং বৈদ্যনাথের কথায় কান না দিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন। ড্রাইভারকে একটু অপেক্ষা করতে বলেই বৈদ্যনাথকে বললেন—'তোমার চেহারাটা এত খারাপ দেখছি কেন?'

বৈদ্যনাথ বললে—'এমন কিছু না। নাইট ডিউটি চলছে কিনা তাই। এই ফর্মটায় একটা সই করে দেবেন স্যার?'

ডাঃ রায় বললেন—'ও-সব এখন থাক। আমি পরশু সকালে কলকাতার বাইরে যাচ্ছি। ঘুরে আসি, তখন দেখা কোরো।'

হাত-ঘড়িটার দিকে তাকিয়েই ড্রাইভারকে গাড়ি ছাড়বার আদেশ দিলেন। গাড়ি চলে গেল, রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল বৈদ্যনাথ।

বৈদ্যনাথের কাছে সব বৃত্তান্ত শুনে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বললেন—'তাই তো, ডাঃ রায় সই করলেন না? তবে তো তোমার একটা বছর নষ্ট হল।'

বৈদ্যনাথ মুষড়ে পড়ল। ডাঃ রায় ওকে যখন একটা চাকরিই দিলেন তখন সে-চাকরিতে উন্নতির সুযোগটুকুই বা করে দিলেন না কেন? ডাঃ রায়ের এই বিমুখতা বৈদ্যনাথের কাছে একটা

রহস্য হয়ে রইল। তবু সে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জিজ্ঞাসা করল—'অন্য কোনো ডাক্তারকে দিয়ে সই করিয়ে নিলে ভর্তি হওয়া যাবে কি ?'

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন—'তা যাবে না কেন। কিন্তু ডাঃ রায় যখন জেনেশুনেই সই করলেন না এবং শিলং থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললেন, তখন নিশ্চয় কোনো একটা কারণ আছে। তোমাকে আর ওয়ার্ড অ্যাসিস্টেণ্ট-এর কাজে রাখা যাবে না—ওটা বে-আইনি হবে। তিন মাসের কোর্স'টা শেষ করলে আর কোনো অসুবিধাই হত না।'

বৈদ্যনাথ উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করল—'উনি ক'দিনের জন্য শিলং যাচ্ছেন ?'

'কাল সকালেই যাচ্ছেন এবং তিন সপ্তাহের জন্য। সুতরাং তিন সপ্তাহ কোর্স অ্যাটেণ্ড না করলে এ-বছরে ত আর ও-কাজে তোমাকে নেওয়া চলবে না।'

পরদিন সকালে বৈদ্যনাথ সোজা হাজির শিয়ালদা স্টেশনে। আসাম মেল দাঁড়িয়ে আছে, ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্ট-এর দিকে খোঁজাখুজি করতে গিয়ে বৈদ্যনাথ দেখতে পেল একটা সাদা কার্ড বসানো। লেখা আছে—Dr. B. C. Roy.

ট্রেন ছাড়তে তখনো মিনিট পাঁচ বাকি, ডাঃ রায়ের দেখা নেই। অধীর হয়ে বৈদ্যনাথ কম্পার্টমেণ্ট-এর সামনের প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে লাগল, হাতে ধরা আছে সেই ফর্ম। আরো দু-মিনিট পার হয়ে গেল, ডাঃ রায়ের তখনো দেখা নেই। ট্রেনের গার্ড আর স্টেশন মাস্টার উদ্‌গ্রীব আগ্রহে ডাঃ রায়ের কম্পার্টমেণ্ট-এর সামনে দাঁড়িয়ে। ডাঃ রায় এখনো পৌছলেন না, তাই নিয়ে দুজনেই উদ্বিগ্ন।

আর যখন দু-মিনিট বাকি তখন দূরে দেখা গেল ডাঃ রায়কে। কাঁটায় কাঁটায় প্ল্যাটফর্মে ঢুকছেন।

পুরো সাহেবী পোশাক কিন্তু গলায় টাই নেই। স্টেশন মাস্টার ও গার্ড ওঁকে দেখে নিশ্চিন্ত হল, বৈদ্যনাথও। কম্পার্টমেন্টের কাছে আসামাত্র বৈদ্যনাথ হাতের ফর্মটা তাড়াতাড়ি ওঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—'স্যার, একটা সই করে দিন, না দিলে আমার চাকরি হবে না।'

বৈদ্যনাথকে এখানেও দেখে ডাঃ রায় বিরক্তি প্রকাশ না করে চোখে-মুখে একটা বিস্ময় এনে বললেন—'তুমি এখানেও ধাওয়া করেছ? আমি ত বলেইছি ফিরে এসে যা করবার করব।'

এক নিশ্বাসে বৈদ্যনাথ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কথাগুলি ডাঃ রায়ের সামনে বলে গেল। হঠাৎ ডাঃ রায় প্যান্টের পকেট ও কোটের পকেট হাতড়াতে লাগলেন। কী একটা যেন খুঁজলেন, পেলেন না। সামনেই প্ল্যাটফর্মের উপর একটা পরিত্যক্ত সিগারেটের প্যাকেটের উপর দৃষ্টি পড়ল। আশেপাশে এত লোক থাকতে কাউকে কিছু বললেন না। নিজেই দু'পা এগিয়ে গেলেন। বিশাল বপু নুয়ে পড়ল প্ল্যাটফর্ম-এর উপর। সিগারেটের প্যাকেটটা কুড়িয়ে নিলেন। প্যাকেটের খোলটা ফেলে দিয়ে ভিতরের সাদা অংশটুকু বার করে তার উপর লিখে দিলেন—

Give him some light work.

B. C. Roy.

কাগজটা বৈদ্যনাথের হাতে দিয়ে শুধু বললেন—'সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে কাগজটা দেখিও।'

গাড়ি ছাড়তে এক মিনিট লেট্ হয়ে গিয়েছে। ডাঃ রায় তাড়াতাড়ি কম্পার্টমেন্ট-এ উঠে বসতেই গার্ড হুইসিল্ দিল, গাড়িও

চলতে শুরু করেছে। বৈদ্যনাথ প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে যাওয়া গাড়িটার দিকে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল।

ডাঃ রায়ের লেখা চিরকুট দেখে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হেসে ফেললেন। মনে মনে তারিফ করলেন বৈদ্যনাথের অদম্য উৎসাহ দেখে। খুশি হয়েই ওকে এবার হালকা কাজ দিলেন, রেকর্ড ক্লার্ক-এর কাজ। প্রত্যেক রুগীর জন্য ডাক্তাররা যে প্রেসক্রিপশন লিখে দেন তা অন্য একটা খাতায় নকল করে রাখাই হল বৈদ্যনাথের এখন একমাত্র কাজ।

তিন সপ্তাহ বাদে শিলং থেকে ফিরে এসে ডাঃ রায় যথারীতি হাসপাতালে রুগী দেখতে যান কিন্তু বৈদ্যনাথের সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ হয়নি। বৈদ্যনাথের মাইনে কুড়ি টাকায় শুরু হয়েছিল, ইতিমধ্যে আরো পাঁচ টাকা বেড়েছে। প্রতি মাসেই পাঁচ টাকা নিজের জন্য রেখে বাকি কুড়ি টাকা মার কাছে পাঠিয়ে দেয়। মাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছে যে পঁচাত্তর টাকা মাইনে হলেই সে কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করবে এবং মাকে নিয়ে আসবে।

জরুরী প্রয়োজনে ডাঃ রায়ের একদিন তাঁরই এক রুগী সম্পর্কে পুরোনো প্রেসক্রিপশনটা একবার দেখা দরকার হল। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আপিস থেকে খাতাটা এনে ডাঃ রায়কে দিলেন। খাতাটার পাতা উল্টে দেখতে দেখতে ডাঃ রায় বললেন—'হাতের লেখাটা কার?'

'রেকর্ড ক্লার্ক-এর স্যার।'

'তা আমি জানি। লোকটি কে?'

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বরাবরই বৈদ্যনাথের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। ডাঃ রায়ের প্রশ্ন শুনে ভয় হল, খাতা লিখতে বৈদ্যনাথ কি কিছু

গণ্ডগোল করে বসেছে? তবু ডাঃ রায় যখন জানতে চেয়েছেন নামটা লুকোনো অনুচিত বিবেচনা করেই বললেন—'বৈদ্যনাথ স্যার। সে তো এই হাসপাতালে আপনারই রুগী ছিল, আপনিই তাকে কাজ দিতে বলেছিলেন।'

বৈদ্যনাথের কথা মনে পড়ে গেল ডাঃ রায়ের। খুশি হয়ে বললেন—'বেশ বেশ। ছেলেটির হাতের লেখা সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন। ওকে বোলো কাল সকালে আমার বাড়িতে গিয়ে দেখা করতে।'

পরদিন সকালে বেলা ন'টার একটু আগেই বৈদ্যনাথ ডাঃ রায়ের বাড়িতে হাজির। এবার আর 'ছিলিপ লাগাও'-এর চেষ্টায় না গিয়ে গেটের সামনে অপেক্ষমান গাড়িটার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। ঠিক ন'টায় ডাক্তার রায় গাড়িতে উঠতে যাবেন, বৈদ্যনাথ দুই হাত তুলে নমস্কার করে বললে—'আমাকে ডেকেছিলেন স্যার?'

একটু বিরক্তির সঙ্গেই ডাক্তার রায় বললেন—'হ্যাঁ ডেকেছিলাম। কিন্তু এতক্ষণে তোমার দেখা করার সময় হল?'

'আমি ত অনেক আগেই দেখা করতে পারতাম। কিন্তু—'

ডাঃ রায় বৈদ্যনাথকে কথা শেষ করতে না দিয়েই হাঁক দিলেন—'দারোয়ান!'

ডাক শুনেই হন্তদন্ত হয়ে এসে দারোয়ান বৈদ্যনাথের উপর চোটপাট শুরু করে বললে—'বহুৎ খতরনাক আদমি। রোজ ইধর আ কে দিল্‌লগি করতে হৈ। নিকালো ইধার সে বেত্‌তমিজ্‌।'

প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ডাঃ রায় বললেন—'খবরদার। কোনো লোকের সঙ্গে এভাবে কথা বলবে না।'

ধমক খেয়েই দারোয়ান কাঁপতে-কাঁপতে সেলাম ঠুকে বললে—'যো হুকুম সাব।'

ডাঃ রায় বৈদ্যনাথকে দেখিয়ে বললেন, 'এই ছেলেটি যখনই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, ওকে ঢুকতে দিও।'

পরমুহূর্তেই বৈদ্যনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন—'কাল সকালে এসো। আজ আর কথা বলবার সময় নেই।'

পরদিন সকাল বেলা আটটার সময় বৈদ্যনাথ ডাঃ রায়ের বাড়িতে উপস্থিত। আজ অবারিত দ্বার, দারোয়ান স্মিতহাস্যে অভ্যর্থনা জানাল। সকাল বেলায় বাড়িতে রুগী দেখা শেষ করে ডাঃ রায় তাঁর লাইব্রেরী ঘরের টেবিলে বসে কাগজপত্র দেখছিলেন। বৈদ্যনাথ সরাসরি সেখানে উপস্থিত হতেই ডাঃ রায় বললেন—'এসেছো? দারোয়ান তাহলে ঢুকতে দিল তোমাকে।'

বৈদ্যনাথ হেসে বললে—'কাল যখন আপনি নিজে বলে দিয়েছেন তখন কার সাধ্যি আমাকে আটকায়!'

বৈদ্যনাথের কথা শুনে ডাঃ রায় কৌতুক করে বললেন—'আমি না বলে দিলেও তোমাকে কি কেউ আটকাতে পেরেছিল? যাক্, যে-জন্য তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি। আমার কিছু ব্যক্তিগত কাজ আছে, তোমায় করে দিতে হবে। তোমার ইংরিজি হাতের লেখা আমার খুব পছন্দ। মেডিকেল জার্নালের জন্যে আমাকে মাঝে-মাঝে কিছু লিখতে হয়। আমার হাতের লেখা যেমন অস্পষ্ট তেমনি কাটাকুটিতে ভরা। টাইপিস্টরা অনেক সময় বুঝতে পারে না, প্রচুর ভুল থেকে যায়। রোজ সকালে এক ঘণ্টা, এই

ধরো আটটা থেকে নটা, তুমি আমার এখানে এসে লেখাগুলি নকল করে দেবে। তারপরে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে টাইপিস্টকে দেব। পারবে তো?'

বৈদ্যনাথ খুশি হয়ে বললে—'হাসপাতালে আমার ডিউটি শুরু হয় দশটার পর। সুতরাং এক ঘন্টা কেন, সকালে যতক্ষণ প্রয়োজন আপনার কাজ করে দেব।'

'ঠিক আছে। তা হলে কাল থেকেই লেগে যাও। হাসপাতালে কত মাইনে তুমি পাও?'

'আজ্ঞে পঁচিশ টাকা পাই।'

'বেশ, আমিও তোমাকে পঁচিশ টাকাই দেব। তাতে কুলোবে তো?'

বৈদ্যনাথ যেন হাতে চাঁদ পেল। বিস্মিত হয়ে বললে—'কুলোবে? কি বলছেন স্যাঁর! আমি ত ভাবছি কলকাতায় বাসা ভাড়া করে মাকে চাঁদপুর থেকে এনে আমার কাছেই রাখব।'

ডাঃ রায় গম্ভীর হয়ে বললেন—'অত উৎফুল্ল হয়ে উঠো না বৈদ্যনাথ। কলকাতা শহরকে তোমার চেয়ে বেশি আমি চিনি। ও-টাকায় কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে মাকে এনে রাখা চলে না। ওতে মারই কষ্ট হবে বেশি। আরো কিছুদিন অপেক্ষা করো।'

পরদিন থেকে রোজ সকালে সাতটার মধ্যেই বৈদ্যনাথ ডাঃ রায়ের বাড়ি চলে আসে।

লেখা কপি করার কাজ প্রথমেই অতি যত্নের সঙ্গে সেরে রাখে। পরে হাতে কিছু সময় থাকলে ডাঃ রায়ের লাইব্রেরীর ডাক্তারী বই ও বিদেশ থেকে আসা মেডিকেল জার্নালগুলি গুছিয়ে রাখে।

কিছুদিনের মধ্যেই বৈদ্যনাথ ডাঃ রায়ের লাইব্রেরী ঘরের যাবতীয় বইপত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে গেল। লেখার পাণ্ডুলিপি রিভাইজ করবার সময় রেফারেন্সের জন্যে কোনো বই, বা পুরোনো জার্নালের প্রয়োজন হলে তৎক্ষণাৎ বৈদ্যনাথ তা ডাঃ রায়ের হাতে হাজির করে দেয়।

॥ ছয় ॥

বেশ কয়েক মাস কেটে যাবার পর ডাঃ রায়ের লেখাও কমে আসতে লাগল, লিখবার সময়ও পেতেন না একেবারেই। হাসপাতালে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন, খুব কঠিন কেস্ না হলে প্রাইভেট প্র্যাকটিসও বড় বেশি একটা করেন না। শুধু সকাল বেলায় বাড়িতে রুগী দেখা আগের মতনই আছে। রাজনীতির সঙ্গে ডাঃ রায়ের পরোক্ষ যোগাযোগ ছিল চিত্তরঞ্জন দাসের আমল থেকেই, এখন প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়লেন। বাড়িতে দেশনেতাদের নিত্য আসা-যাওয়া শুরু হয়ে গেল। আসছেন জওহরলাল, আসছেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আসছেন সরোজিনী নাইডু। মহাত্মা গান্ধীও কখনো কখনো আসছেন। সেই সঙ্গে সাহেবসুবার আনাগোনা বেড়ে গেল। সব দল আর সব সম্প্রদায়ের মধ্যমাণ হলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়।

বৈদ্যনাথ প্রতিদিন সকালে নিয়মিত আসে কিন্তু কাজ কিছুই নেই। লেখা নকল করার আর প্রয়োজন নেই, ডাঃ রায়ের লেখার সময় কোথায়? লাইব্রেরী ঘরের বই আর কাগজপত্র গুছিয়ে রাখা, সে তো পনেরো মিনিটের কাজ। কিন্তু মাসে মাসে মাইনে সে ঠিকই পেয়ে যাচ্ছে। কাজ নেই, অথচ মাইনে নেওয়া!

বৈদ্যনাথের আত্মসম্মানে ঘা লাগল। সে-কথা ডাঃ রায়কে যে নিজের মুখে বলবে সে ফুরসৎ কোথায়!

মাস দুই এ-ভাবে কেটে যাবার পর হঠাৎ একদিন বৈদ্যনাথের

খোঁজ পড়ল। ডাঃ রায় রীতিমত ধমকের সুরে বললেন—'তুমি দু-মাস ধরে মাইনে নিচ্ছ না, কী ব্যাপার বলোতো।'

বৈদ্যনাথ বললে—'কাজ কিছুই নেই, শুধু বসে বসে মাইনে নেব কেন?'

'কাজ নেই মানে? কে বললে কাজ নেই। রোজ নিয়মিত অ্যাটেণ্ডেন্স ত দিয়ে যাচ্ছ।' রুষ্ট হয়েই বললেন ডাঃ রায়।

একটু থেমে গম্ভীর হয়ে বৈদ্যনাথ বললে—'আপনার বাড়ি রোজ আসি আমার নিজের তাগিদে, তার সঙ্গে চাকরির কোনো সম্পর্ক নেই।'

'এই দু'মাস তোমার মাকে তুমি টাকা পাঠাওনি?'

'পাঠিয়েছি, তবে কম। মা লিখেছেন, তাতে' ওঁর কোনো অসুবিধা হবে না, হাতে কিছু টাকা আগেই জমেছে।'

'খুব অন্যায় করেছো বৈদ্যনাথ। এ-কথা তোমার আগেই আমাকে বলা উচিত ছিল।'

'বলব কখন স্যার। আপনি ত সব সময় এখন রাজনীতি আর লোকজন নিয়েই ব্যস্ত।'

ডাঃ রায় চুপ করে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর নরম কণ্ঠে বললেন—'এ সব অভিমানের কথা এখন থাক। যে দু-মাসের মাইনে নাওনি তা আজই নিয়ে নিও।'

কোনো প্রতিবাদ না করে বৈদ্যনাথ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ডাঃ রায় আবার বললেন—'আচ্ছা বৈদ্যনাথ, তুমি না বলেছিলে তোমার মাকে কলকাতায় এনে রাখবে। তার জন্যও ত কোনো চেষ্টা দেখছি না। ব্যাপার কি বলো তো?'

বৈদ্যনাথ বললে—'সে ভার ত আপনিই নিয়েছেন, আপনিই আমাকে বলেছিলেন তার জন্যে ব্যস্ত না হতে।'

'তা না-হয় বলেছিলুম। তোমারও ত উদ্যোগী হওয়া উচিত ছিল। তাছাড়া আমার ত বয়েস হয়েছে, সব কথা কি আর মনে থাকে?'

চোখ দুটি মাটির দিকে রেখে আবেগজড়িত কণ্ঠে বৈদ্যনাথ বলল—'আমার বাবাকে আমি কোনোদিন চোখে দেখিনি। কিন্তু আপনাকে দেখার পর থেকে সে দুঃখ আর আমার নেই। আপনি আমার পিতৃতুল্য। আমি সব রকম কাজ করার জন্য প্রস্তুত, শুধু আপনার নির্দেশ চাই।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে ডাঃ রায় বললেন—'ওহে বৈদ্যনাথ, আমি ত চিরকাল থাকব না, আমারও যাবার সময় হয়েছে। তাছাড়া হাসপাতালে তুমি যে চাকরি করছ তাতে কতই বা আর উন্নতি করতে পারবে। তার চেয়ে বাইরের কোনো আপিসে তোমার উপযুক্ত কী কাজ আছে খোঁজখবর নাও। আমাকেও জানিও, আমার সঙ্গে যদি জানাশোনা থাকে আমিও বলে দেখতে পারি।'

বৈদ্যনাথ খুশি হয়ে বিদায় নেবার অনুমতি চাইতেই ডাঃ রায় বললেন—'তা ব'লে আমার বাড়ির কাজে কিন্তু ফাঁকি দেওয়া চলবে না। রোজ আসা চাই। কাগজ, চিঠিপত্র, বই ইত্যাদি আগে যেমন গুছিয়ে রাখতে সেরকম রাখবে। তাছাড়া সকালে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে যে-সব লোকজন আসে তাদের অ্যাটেণ্ড করাটাও তোমার আরেকটা কাজ হল।'

পরদিন থেকে সকালে এসেই ডাঃ রায়ের বাড়িতে যতগুলি খবরের কাগজ আসে তার ওয়ান্টেড কলমটা মনোযোগ দিয়ে দেখে। কিন্তু পঞ্চাশ ষাট টাকা মাইনের চাকরিতে অন্তত গ্রেজুয়েট হওয়া চাই। বৈদ্যনাথ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে।

দু-চার দিন বাদেই ডাঃ রায় বৈদ্যনাথকে ডেকে বললেন—'ওহে বৈদ্যনাথ, বিলিতি কোম্পানীর ওষুধের কারখানায় কাজ করতে পারবে?'

উৎসাহিত হয়ে বৈদ্যনাথ বলল—'কেন পারব না? আপনি যে-কাজ বলবেন সে কাজই আমি করতে প্রস্তুত।'

'ঠিক আছে, তাহলে তুমি আজ হোক কাল হোক ডালহৌসী স্কোয়ারে ওদের হেড্ অফিসে চলে যাও বেলা সাড়ে নটা থেকে দশটার মধ্যে। কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে আমার বলা আছে, আমার নাম করে দেখা করলেই হবে।'

ডাঃ রায়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বৈদ্যনাথ সোজা চলে গেল ডালহৌসী। এক্ষেত্রে কালক্ষেপ সমীচীন নয়। আপিসে ঢুকে বেয়ারাকে বলল ম্যানেজিং ডিরেক্টারকে জানাতে যে, ডাঃ রায়ের কাছ থেকে একজন লোক এসেছে—দেখা করতে চায়।

বেয়ারা গিয়ে সংবাদ দেবার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রৌঢ় ইংরেজ কামরা থেকে বেরিয়ে এসে সমাদরের সঙ্গে তাকে ঘরে নিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যনাথের মনে পড়ে গেল সেই সেদিনের কথা, যেদিন ডালহৌসী স্কোয়ারের এমন কোনো আপিস বাকী ছিল না যার সিঁড়িতে বৈদ্যনাথ কপাল ঠোকেনি। দেখা করা দূরের কথা রাস্তার কুকুর-বিড়ালের মতো বিতাড়িত হয়েছে।

কামরায় ঢুকেই সাহেব বললে—'আই হ্যাভ হার্ড এভ্রিথিং অ্যাবাউট্ ইউ ফ্রম ডক্টর রয়। তিনি তোমার অনেস্টি আর ইনটিগ্রিটির খুব প্রশংসা করছিলেন। অ্যাট্ দি সেম টাইম আমাকে বলেও দিয়েছেন তোমাকে কোনো হেভী ওয়র্ক না দেবার জন্যে, ইওর হেলথ্ ওন্ট পারমিট।'

বৈদ্যনাথ বাধা দিয়ে বললে—'ডাঃ রায় আমাকে পুত্রের মতো

স্নেহ করেন; তাই এ-কথা তিনি বলেছেন। আমার হেলথ্ এখন ভালই এবং যে-কোনো স্ট্রেনুয়স্ কাজ করতে আমি প্রস্তুত।'

সাহেব মৃদু হেসে বললেন—'হ্যাট কান্ট্ বী মিস্টার বোস্, ডক্টরস্ অ্যাডভাইজ তোমাকে মেনে চলতেই হবে।'

বৈদ্যনাথ চুপ করে রইল। ওর যা বলবার বলেই দিয়েছে, এখন সাহেবের যা করণীয় তিনি করবেন। তবে চাকরি যে এখানে একটা শুর জুটবেই তাতে আর সন্দেহ রইল না। বৈদ্যনাথকে চিন্তিত দেখে সাহেব ব্যস্ত হয়ে বললে—'প্লীজ টেল্ মি, হোয়াট নেচর অব ওয়র্ক ইউ প্রেফার টু হ্যাভ। কী ধরনের কাজ তোমার পছন্দ?'

বৈদ্যনাথের বহুদিনের বাসনা, একটা অল সেকশন ট্রামের টিকিট নিয়ে সারা কলকাতা ঘুরে বেড়ায়। কালীঘাট থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত প্রতিদিন দু'বেলা যখন ও হেঁটে আসাযাওয়া করত অনেক আকাঙ্খার মধ্যে একটি আকাঙ্খাই তখন ওর মনে প্রবল হয়ে উঠেছিল যে ট্রামের অল্ সেকশন্ টিকিট পেলে ইচ্ছেমতো সে সারা কলকাতা ঘুরে বেড়াবে। এই সুযোগে সে সাহেবকে বলে বসল—'আমার অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন্ ত কিছুই নেই, খাতা-পেন্সিল নিয়ে লেখালেখির কাজের উপযুক্ত আমি নই। ফীল্ড ওয়র্ক যদি কিছু থাকে সেকাজই আমার পছন্দ।'

উল্লসিত হয়ে সাহেব বললেন—'হ্যাট্স্ ফাইন, আমি এখুনি বলে দিচ্ছি।'

ঠং করে টেবিলের ঘণ্টা বেজে উঠতেই বেয়ারা এসে হাজির। সাহেব বললেন—'সেলস্ ম্যানেজার মিঃ করনক্ কো সেলাম দেও।'

একটু পরেই মাঝবয়েসী গোলগাল চেহারার এক সাহেব এসে কামরায় ঢুকে মাথাটা একটু নত করে বললে—'গুড মর্নিং স্যার।'

সাহেব মুখ না তুলেই বললেন—মর্নিং, তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি—মীট মিস্টার বি. বোস্, ডক্টর রয়জ্ ক্যাণ্ডিডেট। স্পোক হাইলি অব হিম। সেলস্ ডিপার্টমেণ্ট-এ ফীল্ড ওয়র্কের কাজ করবে। আইল্ ফিক্স আপ হিজ স্যালারি লেটার অন্।'

বৈদ্যনাথকে গুডলাক্ আর গুডউইশ জানিয়ে সাহেব বললেন—'ইফ্ ইউ উইশ, কাল থেকেই তুমি কাজে লেগে যেতে পার।'

ধন্যবাদের সঙ্গে সাহেবের কথায় সম্মতি জানিয়ে বৈদ্যনাথ সেলস্ ম্যানেজারের পিছন পিছন কামরা থেকে বেরিয়ে এল। সেলস্ ম্যানেজার মিঃ করনক্ যে একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, বৈদ্যনাথের তা বুঝতে দেরী হয়নি। চেহারা এবং ইংরিজি উচ্চারণের ধরনই তার পরিচায়ক। করনক সাহেব সঙ্গে করে ডিপার্টমেণ্ট-এ নিয়ে গেলেন, কিন্তু তাঁর মুখে চোখে একটা বিরক্তির ভাব—এ আবারকোন আপদ এখানে এসে জুটল।

॥ সাত ॥

পরদিন সকাল থেকেই কাজে যোগ দেবে, সব ঠিক হয়ে গেল। প্রথম দু'মাস হেড অফিসে, তারপর থেকেই ব্রাঞ্চ শপগুলিতে ঘুরে ঘুরে কাজ করতে হবে। প্রথম কাজ স্টক মেলানো। কোন দোকানে কত ওষুধ সাপ্লাই করা হয়েছে, স্টকে কত আছে এবং পরদিন আর কত সাপ্লাই করতে হবে তার হিসেব রাখা ও রিপোর্ট দেওয়া।

পরদিনই হাসপাতালের চাকরিটা বৈদ্যনাথ ছেড়ে দিল। যতদিন না বাসা ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে ততদিন হাসপাতালে থাকার অনুমতি সে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর কাছ থেকে চেয়ে নিল। সকালে যথারীতি ডাঃ রায়ের বাড়িতে বেলা ন'টা পর্যন্ত থেকে চলে গেল ডালহৌসী স্কোয়ারে। অফিসে যেতেই করনক সাহেব তাকে বসবার টেবিল-চেয়ার দেখিয়ে দিল, কাগজ পত্র বুঝিয়ে দিল। মুখে সর্বদাই একটা গম্ভীর বিরক্তি ভাব।

এক ঘণ্টাও পার হয়নি, হঠাৎ বড় সাহেবের খাস বেয়ারা এসে বৈদ্যনাথকে সেলাম ঠুকে বললে—'সাব আপকো বোলায়া।'

বৈদ্যনাথ তাড়াতাড়ি বড় সাহেবের ঘরে ঢুকতেই তিনি বৈদ্যনাথের হাতে একটা টাইপ করা চিঠি দিয়ে বললেন—'পড়ে দেখো।'

অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। লেখা আছে, বেতন মাসে ৬০৲ টাকা আর কনভেয়েন্স ১৫৲ টাকা। অর্থাৎ টাকার পরিবর্তে একটি অল্ সেকশন ট্রামের টিকিট। চিঠিটা পড়া শেষ হতেই সাহেব বললেন—'ইজ ইট অলরাইট ?'

সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের সীট-এ ফিরে এসে বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল বৈদ্যনাথ, ভাবতে লাগল তার ভাগ্য পরিবর্তনের কথা। একে একে অনেক সুখস্বপ্নই তার মনে উদয় হল। এবার সে কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করবে। অপমান-জর্জর জীবন থেকে মাকে উদ্ধার করে নিজের কাছে এনে রাখবে। এসব স্বপ্নের মূলে রয়েছেন যিনি, সেই ডাক্তার রায়ের কথা বার বার মনে হতেই আবেগে তার দুই চোখ আপ্লুত হয়ে উঠছে।

হঠাৎ সেলস্ ম্যানেজার করনক্ বৈদ্যনাথকে ডেকে পাঠালেন। ঘরে ঢুকেই দেখেন সাহেবের মুখ রাগী বুলডগের মতো খিঁচিয়ে আছে। বৈদ্যনাথকে বললে—'তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের কপি এইমাত্র পেলাম। ডাঃ রায়ের লোক বলেই ম্যানেজিং ডিরেক্টর তোমাকে আশাতিরিক্ত মাইনে দিয়ে রেখেছেন। কারণ ডাঃ রায় হচ্ছেন আমাদের কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর। তোমাকে যে বেতন দেওয়া হয়েছে গ্রাজুয়েটরাও তা পায় না। তোমাকে একটা কথা বলে দিচ্ছি, ডাঃ রায়ের লোক বলে তুমি অ্যাডভান্টেজ নেবার চেষ্টা কোরো না।'

বৈদ্যনাথ বেশ খানিকটা ঘাবড়ে গেল করনক্-এর কথা শুনে। আর এসব কথা চাকরির প্রথম দিনেই তাকে বলার অর্থ কী? বৈদ্যনাথের মেজাজ তখন একটু চড়েছে। গম্ভীর হয়ে বললে—'আমার কাজে যদি আপনি সন্তুষ্ট না হতে পারেন, আমাকে ছাড়িয়ে দেবেন। ডাঃ রায়ের নাম এর সঙ্গে জড়াবেন না।'

অবাক হয়ে সাহেব বললে—'ইজ দ্যাট সো! বেশ একটু শর্ট টেম্পারড মনে হচ্ছে।' পরমূহূর্তেই রীতিমত ধমকে উঠলেন—'যাও নিজের সীট-এ বসে কাজ করো গে যাও। আমাদের কোম্পানীর

ওযুধের প্রাইস্ লিস্টটা সম্পূর্ণ মুখস্ত করতে হবে। পনেরো দিন বাদে আমি পরীক্ষা নেব।'

বৈদ্যনাথ নিজের জায়গায় চলে এল বেশ কিছুটা বিষন্ন মনেই। ওষুধের নাম-দাম ঠিকুজিকুষ্ঠি সব বৈদ্যনাথের আগেই জানা। হাসপাতালে এই কাজই করতে হয়েছে তিন বছর ধরে। সুতরাং করনক্ সাহেবের ওযুধের দাম মুখস্তর পরীক্ষা নেবার ধমকটা ওর কাছে হাস্যকর ব্যাপার। খারাপ লাগছিল ওর মনোভাব দেখে।

এই বিরুদ্ধ মনোভাবের কারণ খুঁজে পেতে বৈদ্যনাথের দেরী হল না। ডিপার্টমেণ্ট-এর বড়বাবু হচ্ছে করনকের একান্ত অনুগত ও বংশবদ। যখনই নতুন লোক নেওয়া হয়েছে সে-লোক বড়বাবু সরবরাহ করেছেন করনকের সঙ্গে পরামর্শ করে, বড় সাহেব কোনোদিন আপত্তি করেননি। বৈদ্যনাথের বেলায় এই রীতির প্রথম ব্যতিক্রম, তার উপর সে ডাঃ রায়ের লোক।

সকালে বৈদ্যনাথ ডাঃ রায়ের বাড়ি যায়। চিঠিপত্র গুছিয়ে ফাইল করে রাখা বা সদ্য-আসা জার্নালগুলি সামনে রেখে পুরোনোগুলি অন্যত্র সরিয়ে রাখা ওর নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। মাঝে মাঝে ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা হলেই জিজ্ঞাসা করেন—'কী হে, চাকরিতে মন বসেছে তো?'

ইতিমধ্যে বৈদ্যনাথ বেলেঘাটা অঞ্চলে দু'ঘরওয়ালা একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছে পঁচিশ টাকা দিয়ে। ডাঃ রায় আরো পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে ত্রিশ টাকা করেছেন, ওষুধের কোম্পানীর কাজে মাইনে পায় ষাট টাকা, সেই সঙ্গে অল্ সেকশন ট্রামের টিকিট। সুতরাং বৈদ্যনাথের আর কোনো অভাব-অভিযোগ নেই, এবার মাকে

সে কলকাতায় স্বচ্ছন্দে এনে রাখতে পারে। মার কাছে যখনই বৈদ্যনাথ এ প্রস্তাব পাঠায় মা চিঠির উত্তরে জানান বৈদ্যনাথকে একবার দেশে যেতে। অনেক বছর দেখেন নি, ছেলেকে দেখবার ত' সাধ যায়। মামারা এখন মায়ের প্রতি খুব সদয়। মাসে মাসে টাকা যাচ্ছে, সে টাকার বেশির ভাগই মা তাঁর ভাইয়ের হাতে তুলে দেন। সুতরাং শহরের ডামাডোলে মাকে ওঁরা একা থাকতে দিতে চান না। ছেলে ত সকাল থেকে রাত্রি চাকরি করবে। মা সারাদিন একা বাড়িতে পড়ে থাকবে, সে হতেই পারে না। বৈদ্যনাথের মামা শুনেছে কলকাতায় চোরেরা দিনদুপুরে বাড়িতে ঢুকে লোক খুন করে পালিয়ে যায়।

একদিন সকালে ডাঃ রায় বৈদ্যনাথকে বললেন—'কী হে, তুমি না বলেছিলে মাকে কলকাতায় নিয়ে আসবে, তার কি হল।'

বৈদ্যনাথ মাথা চুলকে কাচুমাচু হয়ে বললে—'মা ত এখন কিছুতেই আসতে চাইছেন না, উল্টে এক ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে বসেছেন।'

'ফ্যাসাদ আবার কী। কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করেছো, ভাল চাকরি করছো—এর মধ্যে ফ্যাসাদটা কোথায়।'

খুবই সঙ্কোচের সঙ্গে সলজ্জ বৈদ্যনাথ বললে—'মা বারবার লিখছেন সামনের বৈশাখ মাসে একবার দেশে যেতে। মার বয়েস হয়েছে, একা-একা আর ভাল লাগছে না। একটি পাত্রী দেখেছেন, পছন্দও হয়েছে খুব। আমাদের জানাশোনা ঘরের মেয়ে।'

উচ্চৈস্বরে হেসে উঠলেন ডাঃ রায়। বললেন—'তাইতো হে, তুমি যে এখন একজন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার উদ্ধারকারী উপযুক্ত পাত্র হয়ে উঠেছো, সেটা তো আমার খেয়াল ছিল না। খুবই ভাল কথা, তোমার মা ঠিক কথাই লিখেছেন। এই বয়সেই ত বিয়ে

করা উচিত। তাহলে আর কালবিলম্ব না করে এক মাসের ছুটি নিয়ে চলে যাও।'

বৈদ্যনাথ চুপ করে দাঁড়িয়ে। ডাঃ রায় আত্মস্থ হয়ে কী যেন ভাবতে লাগলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন—'বিয়ে ত করতে যাচ্ছ, খরচ আছে তো। টাকাপয়সার কী ব্যবস্থা করেছো। তোমার কাছে বা তোমার মার কাছে কিছু থাকবার কথা নয়।'

বৈদ্যনাথ বললে—'মাকে আমিও সে-কথা লিখেছিলাম এবং আরো কিছুদিন অপেক্ষা করার কথাও জানিয়েছিলাম। কিন্তু কন্যাপক্ষ আর অপেক্ষা করতে রাজী নন বলে মা ধারকর্জ করেই কাজটা বৈশাখ মাসেই চুকিয়ে ফেলতে চান।'

ডাঃ রায় অবাক হয়ে বৈদ্যনাথের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন—'ধার-দেনা করে ছেলের বিয়ে দেবেন? এটা কোনো কাজের কথা হল?'

বৈদ্যনাথ উৎসাহিত হয়ে বললে—'আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনার কথা উল্লেখ করে মাকে লিখে দিই এ-সব হাঙ্গামা না করার জন্যে।'

বৈদ্যনাথের কথায় ডাঃ রায় কোনো সায় দিলেন না। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বললেন—'শ পাঁচেক টাকা হলে খরচপত্র কুলিয়ে যাবে বলে কি তোমার মনে হয়?'

বৈদ্যনাথ বললে—'আমার যদিও কোনো ধারণা নেই, তবে এ টাকায় কুলিয়ে যাওয়া ত উচিত।'

'—ঠিক আছে। তুমি আজই ছুটির দরখাস্ত করে দাও। দেশে যাবার সময় আমার কাছ থেকে পাঁচশ টাকা নিয়ে যেয়ো। এতে যদি কুলিয়ে যায় ভালো না কুলোলে চিঠি লিখো, পাঠাব।'

॥ আট ॥

এক মাস ছুটির পর বৈদ্যনাথ বিয়ে করে একাই কলকাতা ফিরে এসেছে। চেহারা দেখে চেনবার উপায় নেই। তসরের পাঞ্জাবী তাতে সোনার বোতাম, হাতে হাতঘড়ি, আঙ্গুলে সোনার আংটি। এ বৈদ্যনাথ আরেক মানুষ।

ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করতেই বললেন—'বুঝেছো বৈদ্যনাথ, তোমার চেহারা আর সাজপোশাক দেখে এই বুড়ো বয়সে আমারো লোভ হচ্ছে। এই অপাত্রে কেউ পাত্রী দেবে না, এই যা দুঃখ। তা কেমন বউ হল বল। পছন্দ হয়েছে তো?'

বৈদ্যনাথ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল, মুখে সলজ্জ হাসি।

ডাঃ রায় হাসতে হাসতে বললেন—'বুঝেছি, পছন্দ তা হলে হয়েছে। স্বাস্থ্য ভালো তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'মা খুশি হয়েছেন?'

'মা খুবই খুশি।'

ডাঃ রায় মৃদু হেসে বললেন—'এবার মাকে আর বউমাকে কলকাতায় নিজের কাছে এনে রাখো।'

পুজোর সময় কদিনের ছুটিতে দেশে গিয়ে বৈদ্যনাথ মা ও স্ত্রীকে কলকাতায় এনে তুলল বেলেঘাটার বাড়িতে। এখন আর বৈদ্যনাথকে

ডালহৌসীর হেড অফিসে যেতে হয় না, শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের দোকান ঘুরে ঘুরে ওষুধের স্টক্ মিলিয়ে রিপোর্ট দেওয়াই একমাত্র কাজ। এই কাজ করতে করতেই ও টের পেয়েছিল যে করনক্ সাহেব বড়বাবুর সঙ্গে যোগসাজসে এক বিরাট চুরির জাল বিস্তার করে কোম্পানিকে ফোঁপরা করে এনেছে, কিন্তু হাতেনাতে ধরা পড়ার মত কোনো নজির কোথাও রাখেনি। ইতিমধ্যে বৈদ্যনাথের মাইনে আরো কুড়ি টাকা বেড়ে আশী হয়েছে, এখন ওর বেশ স্বচ্ছল অবস্থা। অল সেকশন ট্রামের টিকিট, যখন খুশি যেখানে খুশি ঘুরে বেড়ায়, সময়ে অসময়ে বিভিন্ন দোকানে গিয়ে স্টক চেক্ করে। চুরির আঁচ পেলেও বড় প্রমাণ পাচ্ছে না বলে করনক্ সাহেবকে ও ঘাঁটায় না, তক্কে তক্কে আছে।

ডাঃ রায় তখন একজন সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তারই শুধু নন, আজ তিনি সর্বভারতীয় নেতা। প্রতিদিন সকালে বৈদ্যনাথ ডাঃ রায়ের বাড়ি যায়, কিন্তু কথা বলার ফুরসৎ বড় একটা হয় না। এদিকে বেলেঘাটায় যে পাড়ায় বৈদ্যনাথ থাকে সেখানে ওর খাতির সম্মান বেড়ে গেছে, যেহেতু সে ডাঃ রায়ের প্রিয়পাত্র। তাঁর বাড়িতে ওর নিত্য যাওয়া আসা এ-খবরটা পাড়ার ছেলেছোকরা থেকে মাতব্বরদেরও জানা হয়ে গিয়েছে। পাড়ার পুরোনো বাসিন্দা অঘোরবাবু কঠিন অসুখে তিন মাস শয্যাশায়ী। অত্যন্ত গরিব। বড় ডাক্তার ডেকে দেখাবার সামর্থ্য নেই, ধরপাকড়ের মাতব্বরেরও অভাব। পাড়ার ডাক্তার হাল ছেড়ে দিয়ে বলে গেল, বৈদ্যনাথবাবুকে ধরে একবার ডাঃ রায়কে দেখান। অঘোরবাবুর স্ত্রী বৈদ্যনাথের মার কাছে কেঁদে পড়ল। বৈদ্যনাথ আজ পর্যন্ত এ-সব ব্যাপারে ডাঃ রায়কে কখনো কোনোদিন অনুরোধ করেনি, কিন্তু মায়ের পীড়াপীড়িতে ডাঃ রায়কে সে-কথা বলতে বাধ্য হল।

ডাঃ রায় সব শুনে বললেন—'তোমার মা যখন কথা দিয়েছেন যতই কাজ থাক আমাকে যেতেই হবে। আজই বিকেলে যাব, পাঁচটার সময় এসে আমাকে নিয়ে যেয়ো। যে-ডাক্তার এতদিন ওঁর চিকিৎসা করছিলেন তাঁকে থাকবার জন্যে একটা খবর পাঠিয়ে দাও।'

বিকেল বেলা বৈদ্যনাথ এসে ডাক্তার রায়কে নিয়ে গেল বেলেঘাটায় রুগীর বাড়ি। ভাল করে পরীক্ষা করে ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে দিয়ে যে-ডাক্তার দেখছিলেন তাঁকে বললেন—'বৈদ্যনাথকে দিয়ে খবর পাঠাবে রুগী কেমন থাকে না থাকে।'

রুগীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠবার সময় বৈদ্যনাথ বলল—'স্যার. আমার বাড়ি ত এই পাড়ায়, বেশী দূর নয়। যদি একবার আসেন—'

বৈদ্যনাথের পিঠে মৃদু চাপড় দিয়ে ডাঃ রায় বললেন—'হবে হবে। এ-বাড়িতে নয়, তুমি যখন নিজে বাড়ি করবে তখন সেই বাড়িতে যাব।'

কথাটা বৈদ্যনাথের মনের মধ্যে গেঁথে গেল। কঠিন সংকল্প সে করল, ডাঃ রায়কে ওর বাড়িতে একদিন আনতেই হবে। ইতিমধ্যে ভবানীপুরে একটা ফ্ল্যাট পেয়ে গেল বৈদ্যনাথ। দু-খানা ঘর, ভাড়া চল্লিশ টাকা।

কয়েক বছরের মধ্যেই দেশের চেহারা গেল পালটে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করেছে, বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এখন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সকাল বেলা আর বৈদ্যনাথের ডাঃ রায়ের বাড়ি যাবার প্রয়োজন হয় না, একমাত্র ছুটির দিন ছাড়া। ভবানীপুরের ফ্ল্যাটের চেহারা বদলেছে। দুই ঘরে পাখা এসেছে, রেডিও-সেট এসেছে, নিয়ন বাতি জ্বলছে।

স্ত্রীর গায়ে সোনার গয়নাও উঠেছে। বৈদ্যনাথ এখন দু'টি সন্তানের পিতা। ইতিমধ্যে এক কাণ্ড ঘটে গেল।

বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে সাহেব-পাড়ায় কোম্পানীর যে ওষুধের দোকান আছে, সেখানে হিসাবের প্রচুর গলদ ধরা পড়েছে। বড় সাহেব বৈদ্যনাথকে ভার দিলেন সে-দোকানের সব স্টক আর পুরোনো ক্যাশ মেমো ভালো করে পরীক্ষা করে দেখতে। রাত আটটায় দোকান বন্ধ হয়ে গেলে বৈদ্যনাথের কাজ শুরু হয়, রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত পুরোনো কাগজপত্র ঘেঁটে পরীক্ষা করে, অবশেষে নির্জন রাস্তা দিয়ে হেঁটে সে বাড়ি ফেরে। পুরোনো কাগজপত্র দেখতে দেখতে বেরিয়ে পড়ল করনক্ সাহেবের চোরা-কারবারের মোক্ষম প্রমাণ। হেড আপিসের নির্দেশে কারখানা থেকে যে-মাল দোকানে এসেছে তার কোনো নির্দেশ হেড আপিসের খাতায় নেই, দোকানের খাতায়ও তার এন্‌ট্রি নেই। অথচ কারখানার চালানে দেখা যাচ্ছে হেড আপিসের খাতায় যে-মাল এই দোকানে ডেলিভারি দেওয়া হয়েছে বলে এনট্রি করা আছে তার চারগুণ মাল প্রতি মাসে এই দোকানে এসেছে, অথচ খাতাপত্রে দেখানো হয়েছে যে স্টকে যা মাল ছিল তা খালি হয় নি বলেই মাল পাঠানো হচ্ছে না। এক দোকানের এই গরমিল ধরা পড়তেই ভবানীপুর ও শ্যামবাজারের দোকানে খোঁজ নিয়েও বৈদ্যনাথ দেখল সেখানেও ঐ একই ব্যাপার।

আর কালক্ষেপ না করে বৈদ্যনাথ নথিপত্রের প্রমাণসহ এক গোপন রিপোর্ট সরাসরি পাঠিয়ে দিল ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে। কিছুদিনের মধ্যেই তোলপাড় হয়ে গেল হেড আপিসে। করনক্ সাহেব ডি-গ্রেডেড হলেন—শুধু তাই নয়, অনুকম্পাবশত বড় সাহেব তাকে পুলিসে ধরিয়ে দেননি বটে, বহু টাকার খেসারৎ দাবী করলেন

এবং করনক্ সাহেব আর বড়বাবুকে খেসারতের টাকা দিতেও হল। করনক সাহেব টের পেয়েছিলেন যে এ-কাজটা বৈদ্যনাথ ছাড়া আর কারুর নয়। রাগে গজরাতে লাগলেন তিনি, সুযোগ পেলে প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বেন না।

সুযোগ পেয়েও গেলেন। চাঁদপুর থেকে বৈদ্যনাথের মামা মার কাছে চিঠি লিখে জানিয়েছেন, প্রাণ আর সম্মান নিয়ে ওদেশে এখন আর বাস করা অসম্ভব। আতঙ্কে দিনেরাত্রে ওদের চোখে ঘুম নেই। চিঠি পেয়েই মা কেঁদে পড়লেন বৈদ্যনাথের কাছে।

'একবার যা বৈদ্যনাথ, দেখে আয় ওরা কী অবস্থায় আছে। হাজার হোক আপন মামা, এই বিপদে তুই ছাড়া ওদের আর দেখবার কে আছে।'

মায়ের অনুরোধ, এড়ানো কঠিন বড়। দশ দিনের ছুটি নিয়ে চলে গেল বৈদ্যনাথ প্রথমে ঢাকায়। ডাঃ রায়ের দৌলতে সুরাবর্দী সাহেব ও ফজলুল হকের সঙ্গে পরিচয় ছিল বৈদ্যনাথের। দুজনের কাছ থেকেই চিঠিপত্র নিয়ে চাঁদপুর এসে এস. ডি. ও-র সঙ্গে দেখা করল। এস. ডি. ও প্রচুর খাতির সম্মান করলেন বৈদ্যনাথকে। এমনকি নিজে বৈদ্যনাথের মামার সঙ্গে দেখা করে অভয় দিয়ে বললেন যে, ওঁরা নিশ্চিন্ত হয়ে চাঁদপুরে থাকতে পারেন। গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগতে দেবেন না। এই সব বন্দোবস্ত করে কলকাতায় ফিরতে দশ দিনের জায়গায় হয়ে গেল বাইশ দিন। ইত্যবসরে করনক্ নতুন সেলস্ ম্যানেজারকে হাত করে ফেলেছে, তাকে বুঝিয়েছে বৈদ্যনাথকে এ আপিস থেকে না তাড়াতে পারলে নেটিভের হাতে ওদের পদে পদে অপমান সহ্য করতে হবে।

চাঁদপুর থেকে ফিরে এসে প্রথম সে গেল হেড আপিসে। সেখানে গিয়েই সে শুনতে পেল তার নামে নাকি চার্জ-শীট আনা

হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে—সে কাজে ফাঁকি দেয়, উপরন্তু উইদাউট নোটিশ সে বারো দিন আপিস কামাই করেছে। বৈদ্যনাথ সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিল যে এটা করনকের কীর্তি। খবরটা শুনে সে প্রথমে সেল্‌স্ ম্যানেজারের ঘরে যেতেই তিনি বড় সাহেবের সই করা চার্জ শীট তার হাতে তুলে দিলেন। রাগে ক্ষোভে দুঃখে বৈদ্যনাথের হাতপা ঠকঠক্ করে কাঁপছে। বললে—'চাঁদপুর থেকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম যে আমার ফিরতে দিন দশ-বারো দেরী হতে পারে।'

ম্যানেজার বললেন—'সরি, আমাদের দপ্তরে তোমার কোনো চিঠি এসে পৌঁছয়নি।'

বৈদ্যনাথের আর বুঝতে দেরী হল না যে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে জোট পাকিয়ে এই চার্জ-শীট আনা হয়েছে এবং করনক্ সাহেবই এর মূলে।

বৈদ্যনাথের মাথায় তখন রক্ত চড়ে গেছে। একবার মনে করল সটান বড় সাহেবের কাছে গিয়ে সে কৈফিয়ৎ চাইবে। পরক্ষণেই তার অভিমানে ঘা লাগল। চার্জ শীট-এ বড় সাহেব যখন সই করেছেন তখন বিশ্বস্ততার কোনো মূল্যই এদের কাছে নেই। এ আপিসে আর এক দিনও তার পক্ষে চাকরি করা সম্ভব নয়, তা সে আগেই বুঝে গিয়েছিল। তবু চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে যাবার আগে করনকের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিতে হবে।

ম্যানেজারের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঝড়ের বেগে সুইং ডোর খুলে করনকের ঘরে ঢুকেই বৈদ্যনাথ ফেটে পড়ল। বৈদ্যনাথের চোখে মুখে একটা হিংস্র মারমূর্তি ভাব। চাপা আক্রোশপূর্ণ কণ্ঠে বৈদ্যনাথ বললে—'আমার নামে মিথ্যা চার্জ-শীট দিয়েছ কেন?'

'করনক্ নির্বিকার কণ্ঠে উত্তর দিল—'আমি কি জানি। আস্ক দি ম্যানেজার।'

'কিন্তু আমি জানি, তোমার ইন্‌স্টিগেশনেই এটা করা হয়েছে।'

করনক্ আবার মোলায়েম কণ্ঠে বললে—'বিকজ্ ইউ আর গিলটি।'

টেবিলের উপর প্রচণ্ড ঘুষি মেরে চীৎকার করে উঠল বৈদ্যনাথ—'হোয়াট? চুরি করবে তোমরা আর সেই চোর ধরিয়ে দেবার জন্যে গিলটি হলাম আমি?'

করনক্ প্রথমে ঘাবড়ে গেল বৈদ্যনাথের মারমূর্তি দেখে। ওদিকে চীৎকার শুনে আপিসের বয়, বেয়ারা ও অন্যান্য কেরানীরা ছুটে এসেছে। করনক্ তখন বীরত্ব দেখাবার জন্যে গর্জন করে উঠল—'গেট আউট ফ্রম মাই রুম ইউ সোয়াইন। ডাঃ রায়ের লোক বলে তুমি যে আমাদের উপর চোখ রাঙাবে তা চলবে না।'

বৈদ্যনাথ বললে—'ডাঃ রায়ের নাম উচ্চারণ করেছো তো তোমার জিভ ছিঁড়ে ফেলে দেব।'

করনক্ মুখটা যতদূর সম্ভব বিকৃত করে বললে—

'—রেখে দাও তোমার ডাক্তার রায়।' এই বলেই করনক্ এমন কতগুলি কথা বলল যে বৈদ্যনাথ দিক বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে এক কাণ্ড করে বসল। পোর্টফোলিও ব্যাগ ছিল ওর হাতে। সেটা খুলেই খোপ থেকে একটা পিস্তল ক্ষিপ্রবেগে বের করেই করনকের কপাল লক্ষ্য করে একেবারে খাস চাঁদপুরী জবানীতে চীৎকার করে বলল—'আইজ তরে শ্যাশ করুম কুত্তার বাচ্চা। তরে আইজ আমি মাইরাই ফালামু।'

করনক এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়েই হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে চেঁচাচ্ছে, 'হেলপ, হেলপ।'

পিছনে পিস্তল নিয়ে তাড়া করেছে বৈদ্যনাথ, মুখে এক কথা—'তরে আইজ মাইরাই ফালামু।'

অফিসের যে বেয়ারাগুলি প্রথমে এ-দৃশ্য দেখে হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল, পরমুহূর্তেই তারা একজোটে ঝাঁপিয়ে পড়ল বৈদ্যনাথের উপর। ওদিকে সঙ্গে সঙ্গে লালবাজারে ফোন করে দেওয়া হয়েছে, পুলিস এসে পিস্তলসহ বৈদ্যনাথকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।

॥ নয় ॥

পুলিস অফিসার বারবার করে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল বৈদ্যনাথকে, কোনো উত্তর নেই। অনেক ধমক, অনেক ভয় দেখানো হল, বৈদ্যনাথ বোবা হয়ে বসে আছে। শুধু বললে—'আপনার টেবিলের টেলিফোনটা একবার ব্যবহার করতে দেবেন?'

অফিসার বললে—'আপনার গুণ্ডার দলকে খবর দিতে চান ত? ওসব এখন হবে না। আজকের দিনটা ত লক-আপে থাকুন, পিস্তল কোথায় পেয়েছেন স্বীকার না করলে বেশ ভাল রকম কম্বল-ধোলাই হোক, তারপর দলবলকে খবর দেওয়া। তাছাড়া কাল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করার পর বেইল নেবার প্রশ্ন।'

অনেকক্ষণ ধরে বৈদ্যনাথকে অকথ্য কুকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে পুলিস অফিসার ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। একটু বিশ্রাম নেবার জন্য টেবিলের উপর পা দুটো তুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে মনের সুখে ধোঁয়া ছাড়ছিলেন। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভারটা তুলে নিলেন।

'হ্যালো।'

ওদিক থেকে কী একটা কথা হতেই স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মত অফিসার চেয়ারে খাড়া হয়ে বসলেন আর বলতে লাগলেন—'হ্যাঁ স্যার, এখানেই আছে স্যার, ভালই আছে স্যার, এক্ষুনি নিয়ে যাচ্ছি স্যার, দশ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাচ্ছি স্যার, ও কিছু ভাববেন না স্যার।'

টেলিফোনটা রেখেই বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে পুলিস অফিসার

বললেন—'ওরে বাবা! আপনি যে দেখছি খোদ কর্তার লোক! উঠুন, এক্ষুনি দশ মিনিটের মধ্যে আপনাকে খোদ কর্তার কাছে হাজির করতে হবে।'

পুলিস অফিসার রুমাল বার করে ভালো করে কপালের ঘাম মুছলেন, টেবিল থেকে হ্যাটটা মাথায় দিতে দিতে বললেন—'গোড়াতে বললেই হত, মিছিমিছি আপনার উপর এত চোটপাট করলাম।'

বৈদ্যনাথ বললে—'আপনি আমাকে টেলিফোন করতে দিলেন কোথায়।'

'যাক, যা হবার হয়ে গেছে। আপনি মশাই দয়া করে কর্তার কাছে আমাদের বিরুদ্ধে আবার নালিশ করবেন না।'

বৈদ্যনাথ ঠিকই অনুমান করেছিল যে ডাঃ রায়ের কাছ থেকে তলব এসেছে। ওষুধ কোম্পানীর বড় সাহেব নিশ্চয় টেলিফোন করে ডাঃ রায়কে খবরটা দিয়েছে। বৈদ্যনাথ অফিসারকে বললে—'আপনাদের বিরুদ্ধে আমার কি বলবার থাকতে পারে, আপনারা আপনাদের কর্তব্যই করেছেন।'

রাইটার্স বিল্ডিং-এ ডাঃ রায়ের ঘরে পুলিস অফিসারের সঙ্গে ঢুকল বৈদ্যনাথ। ডাঃ রায় নিবিষ্ট মনে একটা চিঠি পড়ে ডিকটেশন দিচ্ছিলেন স্টেনোকে। থেমে গেলেন। বৈদ্যনাথের দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নিলেন। স্টেনোকে বললেন চলে যেতে, বললেন পুলিস অফিসারকেও। পুলিস অফিসার স্যালুট দিয়ে বিদায় নিতেই ডাঃ রায় বজ্রগম্ভীর গলায় বললেন—'তুমি আমার নাম ডুবিয়েছ বৈদ্যনাথ, আমার মুখে চুনকালি দিয়েছ। আমি ধারণাই করতে পারিনি তুমি এমন জঘন্য কাজ করবে।'

বৈদ্যনাথ নম্র কাতর কণ্ঠে বলল—'আমার কথাটা একবার শুনবেন স্যার ?'

ডাঃ রায় আরো গম্ভীর গলায় বললেন—'আমি তোমার কোনো কথাই আর শুনতে চাই না। তুমি আমার সামনে থেকে এখনি চলে যাও।'

ডাঃ রায়ের চোখে মুখে একটা তীব্র বিরক্তি। বৈদ্যনাথ বুঝল ডাঃ রায়ের কাছে আজ আর সে স্নেহের পাত্র নয়, ঘৃণার পাত্র। তবু আরেকবার সাহস করে বলল—'আপনি আমার একটা কথাও কি শুনবেন না স্যার ?'

'না, একটা কথাও না।' বজ্রকঠোর কণ্ঠের আদেশ। 'তোমার সঙ্গে আর আমার কোনো সম্পর্ক নেই, থাকতে পারে না। তুমি যেতে পার।'

বৈদ্যনাথ নীরবে মাথা নীচু করে দরজা খুলে বেরোতে যাবে, ডাঃ রায় কাগজের উপর থেকে মুখ না তুলেই বললেন—'যাবার আগে আর একটা কথা শুনে যাও। আর কোনদিন আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করো না।' একটু থেমে চাপা অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন —'যাবার সময় দরজাটা নিজের হাতে বন্ধ করে চলে যেও।'

ডালহৌসি স্কোয়ারের রাস্তায় বেরিয়ে বৈদ্যনাথ বুঝতে পারল ডাঃ রায়ের দরজা তার কাছে চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে গেল। বিকেল পাঁচটা বেজে গিয়েছে। আপিস ছুটির পর বাড়ি ফেরার তাগাদায় লোকজন ব্যস্ত হয়ে ছুটে চলেছে, বাড়ি ফেরার কোনো তাড়া বা তাগাদা নেই শুধু বৈদ্যনাথের।

রাইটার্স বিল্ডিং-এর পূব পাশের গির্জার রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল বৈদ্যনাথ। আজ এই জনাকীর্ণ শহরে সে নিঃসঙ্গ, অসহায়, আশাহত। সামনে অন্ধকার ভবিষ্যৎ, পিছনে ফেলে এল এক

বিশাল মহীরুহের স্নেহাচ্ছাদন। কোথায় যাবে সে, তার গন্তব্য স্থল সে হারিয়েছে। সামনে কয়েক পা হেঁটে গেলেই ওষুধ কোম্পানীর হেড আপিস। সে দরজাও চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ঘরে ফেরার আজ আর কোনো তাড়া নেই। ঘরে ফিরে মার কাছে, স্ত্রীর কাছে, পুত্র-কন্যাদের কাছে সে মুখ দেখাবে কি করে? চোখের সামনে বিরাট শূন্যতা নিয়ে কার্জন পার্কের নির্জন কোণায় চুপচাপ বসে রইল বৈদ্যনাথ।

॥ দশ ॥

বৈদ্যনাথ হাল ছাড়েনি, হার মানতে সে রাজী নয়। আরেকবার সে তার ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে দেখতে চায়। পরদিন থেকে সকালেই সে বেরিয়ে যায়, ফেরে অনেক রাত্রে। কোথায় যায়, কোথায় ঘোরে, বাড়িতে সে কিছুই বলে না। যখন ফেরে শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন বৈদ্যনাথের তখন আর কথা বলবার মত মনের অবস্থা নয়। এমনি করেই চাকরির ব্যর্থ চেষ্টায় তিন মাস কেটে গেল। মা আবার নীরবে চোখের জল ফেলেন, স্ত্রী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সমবেদনা জানায়। সংসারের এই থমথমে ভাব ছেলেমেয়ে দুটিকেও মুহ্যমান করে ফেলেছে। এই তিন মাসেই বৈদ্যনাথের চেহারা অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। সঞ্চয় সামান্য যা-কিছু ছিল তা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। শখ করে যে পাখা রেডিও কিনেছিল, একে একে সেগুলি বিক্রী করে দিয়েছে, এবার টান পড়েছে বৌ-এর গয়নার উপর।

ডাঃ রায়ের কথা একদিনও বৈদ্যনাথ ভোলেনি। প্রচণ্ড অভিমান নিয়ে সেদিন সে ডাঃ রায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। অভিমান এই জন্যে যে তার কথা ডাঃ রায় কিছুই শুনলেন না। অপরাধটাকেই বড় করে দেখলেন, অপরাধের কারণটা জানতে চাইলেন না। একটা ভুল ধারণার জন্য তার জীবনদাতা ডাঃ রায়ের কাছে সে চিরদিনের মত ঘৃণার পাত্র হয়েই থাকবে, এই মানসিক যন্ত্রণা তাকে অস্থির করে তুলছিল। বৈদ্যনাথ এটুকু জানত যে একবার যদি ডাঃ রায়কে সে সব কিছু বলবার সুযোগ পেত তা হলে নিশ্চয় তিনি তাঁর মত পালটাতেন।

পরদিন খুব ভোরে বৈদ্যনাথ চলে গেল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ডাঃ রায়ের বাড়ি। সে জানতো, সকাল আটটার মধ্যেই ডাঃ রায় আজকাল রাইটার্স বিল্ডিং-এ চলে যান। ঘরে ঢোকবার অধিকার আজ আর তার নেই। এখন গেট-এ থাকে বন্দুকধারী সান্ত্রী, ছাড়পত্র ছাড়া তাকে ঢুকতে দেবেই বা কেন! বাড়ির দক্ষিণ দিকের যে গেটটায় পুলিস ভ্যান দাঁড়িয়ে থাকে এবং যে গেট দিয়ে ডাঃ রায় বাড়ি থেকে বেরোন সেই গেট এর উল্টোদিকের ফুটপাথে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বৈদ্যনাথ।

আটটা বাজবার একটু আগেই ডাঃ রায়ের বিরাট গাড়ি গেট-এর সামনে দাঁড়াল। মিনিট দশ বাদেই ডাঃ রায় বেরিয়ে এসে গাড়িতে ঢুকে বসলেন। বৈদ্যনাথের মনে হল গাড়িতে বসে ডাঃ রায় তার দিকে একবার বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন। গাড়ি চলে গেল।

বৈদ্যনাথ তার কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে। যতদিন না ডাঃ রায় ওর প্রতি প্রসন্ন মুখ তুলে তাকাচ্ছেন ততদিন রোজ সকাল আটটায় সে বাড়ির দক্ষিণ গেট-এর উল্টো ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকবে। দ্বিতীয় দিনেও একই অবস্থা, তৃতীয় দিনেও তাই। ডাঃ রায় বৈদ্যনাথকে দেখেও যেন দেখতে পাননি।

চতুর্থ দিন সকাল সাড়ে সাতটায় ফুটপাথে সবে এসে দাঁড়িয়েছে, সামনের পুলিস ভ্যান থেকে এক বন্দুকধারী সেপাই এসে বললে—'বাবুজী, কয়ী রোজ সে দেখতা হুঁ আপ ইসি বখ্‌ত্‌ ইধর্ খাড়ে রহ্‌তে হেঁ। আপকা মতলব?'

বৈদ্যনাথ ম্লান হেসে বললে—'মতলব কিছু নেই সিপাহীজী, সিরিফ দর্শনকে লিয়ে।'

সেপাই মাথা দুলিয়ে বললে—হাঁ, ওহ্ তো সহী বাত। তব ঠিক হ্যায়।'

আটটা বাজবার একটু পরেই ডাঃ রায় বেরিয়ে এলেন। অপর দিকের ফুটপাথে বৈদ্যনাথকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আজ আর উপেক্ষা করতে পারলেন না। তাছাড়া এই ক'মাসে বৈদ্যনাথের চেহারার যে হাল হয়েছে তা দেখে ডাঃ রায়ের মনেও বোধহয় আশংকা দেখা দিয়েছিল যে, আবার একটা শক্ত অসুখে পড়তে পারে।

ডাঃ রায় হাতের ইশারায় বৈদ্যনাথকে কাছে ডাকলেন। বৈদ্যনাথ সশংকিত চিত্তে এগিয়ে এল। ডাঃ রায় শুধু বললেন—'গাড়িতে উঠে বোসো।'

নিঃশব্দে বৈদ্যনাথ সামনে ড্রাইভারের পাশে উঠে বসল। পুলিস ভ্যানের সিপাহীর দল ফ্যাল ফ্যাল করে বৈদ্যনাথের দিকে তাকিয়ে। গাড়িতে যেতে যেতে ডাঃ রায় কোনো কথা বললেন না, খুবই গম্ভীর। রাইটার্স বিল্ডিং-এ এসে গাড়ি থামতেই ডাঃ রায় আবার মুখ খুললেন—'আমার সঙ্গে এসো বৈদ্যনাথ।'

বৈদ্যনাথকে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকবার সময় ডাঃ রায় তাঁর খাস বেয়ারাকে বলে দিলেন যেন ওঁর ঘরে এখন কেউ না ঢোকে। এ দরজা একদিন নিজের হাতে বন্ধ করে এই কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল বৈদ্যনাথ। এবার সে দরজার পর্দাটা ডাঃ রায় নিজের হাতে খুলে বৈদ্যনাথকে ভিতরে আসতে বললেন।

নিজের চেয়ারে বসে ডাঃ রায় প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমাকে আমি বলে দিয়েছিলাম যে আমার সঙ্গে আর কোনোদিন দেখা করবে না।'

বুকভরা অভিমান জমিয়ে রেখেছে বৈদ্যনাথ এতদিন ধরে,

এবার তা প্রকাশ হতে লাগল। সে বললে—'আমি ত আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাইনি।'

'তাই যদি হবে, আমি রোজ বেরোবার সময় ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকতে কেন?'

বৈদ্যনাথ আগের মতই অভিমানী কণ্ঠে বললে—'কলকাতা শহরের যে-কোনো ফুটপাথে যে-কোনো নাগরিকের দাঁড়াবার অধিকার আছে বলেই আমি জানি। অবশ্য যদি সেটা প্রোটেকটেড এরিয়া না হয়।'

ডাঃ রায় এবার হেসে বললেন—'যাক্, নাগরিক অধিকার সম্পর্কে তোমার জ্ঞান ত দেখছি টনটনে। তাহলে আনলাইসেন্সড্ পিস্তল নিয়ে তোমার আপিসের লোককে ওভাবে মারতে গিয়েছিলে কেন? অবশ্য আমি শুনেছি যে পিস্তলে গুলি ভরা ছিল না। কিন্তু পিস্তলটাই বা তুমি পেলে কোথায়?'

বৈদ্যনাথ বললে—'পিস্তল কোথায় পাওয়া যায় আপনি তা ভালো করেই জানেন, তবু কেন আমায় জিজ্ঞাসা করছেন।'

ডাঃ রায় গম্ভীর হয়ে বললেন—'হুঁ বুঝেছি। তা কত টাকায় কিনেছিলে?'

'দুশো টাকায়।'

ডাঃ রায় অবাক হয়ে বললেন—'তোমার সামান্য আয়, তুমি দুশো টাকা দিয়ে পিস্তল কিনতে গেলে কেন?'

এবার বৈদ্যনাথ ডাঃ রায়কে আদ্যোপান্ত সব ঘটনা খুলে বলল। তারপর বলল—'আমার মনে একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছিল যে করনক্ আমাকে গুণ্ডা লাগিয়ে শায়েস্তা করবার মতলব করছে। বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডের দোকানে কাজ সেরে অনেক রাত্রে নির্জন অন্ধকার রাস্তা দিয়ে প্রায়ই আমাকে হেঁটে বাড়ি

ফিরতে হত। আত্মরক্ষার জন্যই এই পিস্তলটি আমি সংগ্রহ করেছিলাম।'

সব শুনে ডাঃ রায় আবার বললেন—'তোমার কি সত্যিই উদ্দেশ্য ছিল আপিসের লোকটাকে খুন করার? না কি শুধু ভয় দেখাতেই চেয়েছিলে।'

'খুন করতেই চেয়েছিলাম স্যার। তখন রাগ মাথায় এত চড়ে গিয়েছিল যে, পোর্টফোলিও ব্যাগের অন্য খাপে যে গুলি আছে তা পিস্তলে ভরে নেবার খেয়ালই হয়নি।'

একথা শুনে ডাঃ রায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বিস্মিত হয়ে বললেন—'তুমি খুন করতেই চেয়েছিলে? ছিঃ বৈদ্যনাথ, ছিঃ।'

বৈদ্যনাথ বললে—'আপনি আমাকে ধিক্কার দিতে পারেন কিন্তু উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ ছিল বলেই আমি তাকে খুন করতে গিয়েছিলাম।'

ডাঃ রায় বিস্মিত হয়ে বললেন—'কী এমন কারণ থাকতে পারে যে তুমি তোমার আপিসের একজন পদস্থ কর্মীকে খুন করবে।'

চুপ করে রইল বৈদ্যনাথ।

ডাঃ রায় আবার বললেন—'চুপ করে রইলে যে, বলো।'

বৈদ্যনাথ গম্ভীর হয়ে বলল—'সে জানে আপনার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক। সে জানে আমি আপনার লোক, আপনার রেকমেণ্ডেশনে আমি ওখানে চাকরি পেয়েছি। তা সত্ত্বেও তার এতবড় দুঃসাহস, সে আমার মুখের উপর আপনার নামে জঘন্য কুৎসা বলে যাবে?'

বৈদ্যনাথের কথা শেষ হতে না হতেই ডাঃ রায় প্রচণ্ড শব্দে হেসে উঠলেন, সে-হাসি আর থামে না। বৈদ্যনাথ অবাক হয়ে গেছে ডাঃ রায়ের এই দমকা হাসি শুনে। তখনো ডাঃ রায় হাসছেন, হাসতে হাসতে বললেন,—'এইজন্যে তুমি মানুষ খুন করতে গেলে?

এ-ব্যাপারে তুমি বাংলাদেশে খুন করার মতো হাজার হাজার লোক পাবে। বহুকাল ধরেই আমার নামে অনেক কুৎসাই লোকমুখে রটনা হচ্ছে। ইদানিং তোমাদের মুখ্যমন্ত্রী হবার পর সেটা বেড়েছে বই কমেনি।'

বৈদ্যনাথ বললে—'আপনি কথাটা হেসে উড়িয়ে দিতে পারেন, কিন্তু আমি পারি না।'

ডাঃ রায় বললেন—'থাক, তোমাকে আর খুনখারাপির মধ্যে গিয়ে দরকার নেই। বারবার তোমার হয়ে জামিন নিতে পারব না বাপু। কুৎসা রটনাকারীরা বলবে আমিই তোমাকে এ-কাজে লাগিয়েছি।'

বৈদ্যনাথ এতক্ষণে বুঝতে পারল যে ডাঃ রায়ের মন থেকে ওর প্রতি পুঞ্জীভূত ঘৃণার বেশ খানিকটা অপসারিত হয়েছে। এইটুকুই ওর কাম্য ছিল। হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে বৈদ্যনাথ বলল—'আপনার কাজের অনেক ক্ষতি করলাম, এবার আমি যাই।'

ডাঃ রায় বললেন—'কিন্তু একটা কথা তো কিছুই আমাকে বললে না, তুমি কী করছ এখন।'

'কিছুই নয়। চেষ্টাচরিত্র করেছিলাম, মনের মত কাজ পাইনি আর পেলেও মাইনে দিতে চায় নিতান্ত কম।'

'সংসার চলছে কি করে?'

'শৌখিন জিনিস দু-চারটে করেছিলাম, তা বেচে দিয়েছি। তাছাড়া গয়না কিছু ছিল স্ত্রীর কাছে, এখন তাই বিক্রী করে চলছে।'

ডাঃ রায় কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন—'ছেলেমেয়ে দুটির কী অবস্থা?'

বৈদ্যনাথ বললে—'তাদের দিকে তাকানো যায় না। হাড়-

জিরজিরে হয়ে গেছে। আজ তিন মাস চাকরি নেই, ওদেরই বা খাওয়াব কি।'

ডাঃ রায় আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন—'খুব অন্যায় করেছো বৈদ্যনাথ। আচ্ছা, তুমি আমার এখানে একটা কাজ নেবে? স্টেট ট্রান্সপোর্টে আমার একজন বিশ্বস্ত লোক দরকার। তুমি যদি এ-কাজটা নাও আমি নিশ্চিন্ত হই।'

বৈদ্যনাথ বললে—'না। সরকারী চাকরি আমি নেব না। আপনার সঙ্গে আমার পিতাপুত্র সম্পর্ক। সে সম্পর্কআমি নষ্ট হতে দিতে চাইনে।'

ডাঃ রায় চুপ করে রইলেন, কোনো কথা নেই। বৈদ্যনাথ বললে—'এবার আমি যেতে পারি স্যার?'

'হ্যাঁ, তুমি যেতে পারো। তবে একটা কাজ তোমাকে করতে হবে। ওষুধের কোম্পানী সম্বন্ধে তোমার যা-কিছু অভিযোগ তা লিখিতভাবে আমাকে তুমি পাঠিয়ে দিও। আরেকটা কথা। যদি কখনো কোনো প্রয়োজন হয় অসংকোচে তা জানাবে।'

বৈদ্যনাথ বললে—'আমার একটা শুধু অনুরোধ আছে আপনার কাছে। চাকরির চেষ্টা আমি নিজেই করব, তবে আপনার নাম করে যদি পরিচয় দিই আপনার আপত্তি হবে না তো?'

ডাঃ রায় বললেন—'কোনো আপত্তি নেই। প্রয়োজন হলে কাউকে যদি কিছু বলে দিতে হয় আমায় জানিও।'

বৈদ্যনাথ আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, মনের সব গ্লানি ওর মুছে গেছে।

খবরের কাগজের ওয়ান্টেড কলম দেখে দেখে বৈদ্যনাথ গিয়ে হাজির হল এক বিলিতি তেল কোম্পানীর আপিসে। বেয়ারার

হাতে একটা চিরকুট লিখে জানালে যে সে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছ থেকে এসেছে, বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যনাথের ডাক পড়ল বড় সাহেবের ঘরে। কী ব্যাপার? বৈদ্যনাথ বললে যে সে কাগজে বিজ্ঞাপন পড়ে জেনেছে একজন অ্যাসিস্টেন্ট সেলস্ ম্যানেজার প্রয়োজন, সে সেই পদে চাকরিপ্রার্থী।

বড় সাহেব এই যুবকের দুঃসাহসিক অভিযানে বিরক্ত না হয়ে কৌতুক বোধ করলেন। জিজ্ঞাসা কয়লেন—'তোমার কোয়ালিফিকেশন?'

'ম্যাট্রিক পাস।'

'এ-কাজ যে গ্র্যাজুয়েট ছাড়া নেওয়া হবে না বিজ্ঞাপনে তা লেখা আছে দেখোনি?'

'দেখেছি। তবু আমি সাহস করে এসেছি এই কারণে যে এ ধরণের কাজে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে এবং আমার বিশ্বাস যোগ্যতার সঙ্গেই এ-কাজ আমি করতে পারব।'

বড় সাহেব ঘণ্টা বাজিয়ে আপিস ম্যানেজারকে ডেকে পাঠিয়ে বৈদ্যনাথের নাম ঠিকানা সমেত একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়ে ছেড়ে দিলেন। দিন সাতেক বাদেই বৈদ্যনাথের নামে তেল-কোম্পানীর বড় সাহেবের চিঠি এসে হাজির। তাকে চাকরিতে নিয়োগ করা হল। মাইনে ৩০০৲ টাকা। অ্যাসিস্টেন্ট সেলস্ ম্যানেজারের পোস্ট। চাকুরিস্থল আসানসোল। ফ্রি কোয়ার্টার। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পয়লা তারিখে আসানসোল আপিসে রিপোর্ট করতে হবে। সেখানেও এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হল।

চিঠি পেয়েই পরের রবিবার সকালে বৈদ্যনাথ ডাঃ রায়ের বাড়ি

হাজির। চিঠি দেখে ডাঃ রায় হাসতে হাসতে বললেন—'আমি জানি চিঠি তোমার কাছে যাবে। সাহেব টেলিফোন করে তোমার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমার যা বলবার বলে দিয়েছি। কাজটা পেয়ে খুশি তো?'

কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল বৈদ্যনাথের মন। বললে—'এ আমার কল্পনার অতীত। কিন্তু—'

'এর মধ্যে আবার কিন্তু কেন? লেগে যাও কাজে।'

'কিন্তু স্যার, কলকাতা ছেড়ে আসানসোলে যেতে মন চাইছিল না। তাছাড়া ওখানে গেলে আপনার সঙ্গে দেখা হবার সুযোগ কমে যাবে!'

ডাঃ রায় হেসে বললেন—'কলকাতায় থেকেই বা আমার সঙ্গে কদিন তোমার দেখা হয়। ভুল কোরো না, আসানসোলেই যাও। ওখানে খরচ কম, ফ্রি কোয়ার্টার পাচ্ছ, ছেলে-মেয়েদের এডুকেশন ফ্রি, জিনিসপত্রের দাম কলকাতার থেকে সস্তা। খোলামেলা জায়গায় স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে। আমার সঙ্গে দেখা করা? সে তো যে-কোনো ছুটির দিন এলেই দেখা হতে পারে।'

আসানসোল যাওয়া স্থির করে বৈদ্যনাথ ডাঃ রায়ের কাছ থেকে চলে এল। আসবার আগে শুধু একটি কথা বলে দিলেন—'কাজে কখনো আলস্য প্রকাশ কোরো না। দেখো, এবার যেন আমার মুখে চুনকালি না পড়ে।'

॥ এগারো ॥

বেশ কয়েক বছর পার হয়ে গেছে। বৈদ্যনাথ এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। সেলস ম্যানেজার রিটায়ার করার পর বৈদ্যনাথকে সেই পদে বহাল করা হয়েছে, এখন তার মাইনে সাত শ' টাকা। তাছাড়া বছরে মোটা টাকার বোনাস, তদুপরি কমিশন আছেই। টালিগঞ্জ অঞ্চলে বৈদ্যনাথ কয়েক বছর আগে একটা জমি কিনেছিল, এখন সে সেখানে বাড়ি তুলেছে। একতলা ছোট্টো সাজানো গুছোনো বাড়ি, সামনে খোলা জমিতে দেশী ফুলের মনোরম বাগান। মা, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা এখন কলকাতায় থাকে, বৈদ্যনাথ প্রতি শনিবার কলকাতায় আসে। রবিবার সকালটা ডাঃ রায়ের বাড়িতে কাটিয়ে পরদিন ভোরের ট্রেনে আসানসোল ফিরে যায়। কলকাতায় ট্রান্সফারের চেষ্টা করছিল বৈদ্যনাথ। ডাঃ রায়কেও অনুরোধ জানিয়ে গেল যদি তিনি একটু বলে দেন।

বৈদ্যনাথ আজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত, সে আজ সফল, সুখী। তার সব আকাঙ্ক্ষাই আজ পূর্ণ, শুধু একটি সাধ তার আজও অপূর্ণ থেকে গেছে। ডাঃ রায়কে ওর বাড়িতে নিয়ে আসার বাসনা তার বহুদিনের। তিনি নিজেই একদিন বলেছিলেন—'তুমি নিজে বাড়ি করো, তখন যাবো।'

আসানসোল থেকে কলকাতা নিজের বাড়িতে আসার পর থেকে বৈদ্যনাথের মায়ের শরীর ভালো যাচ্ছিল না। কিছু খেলেই

পেটে অসহ্য যন্ত্রণা। খাওয়ার পরই সব বমি হয়ে যায়, কিছুই হজম হয় না। পাড়ার ডাক্তারদের দিয়ে অনেক চিকিৎসা করালো। কিছুদিনের মতো উপশম হয়, আবার বাড়াবাড়ি। পাড়ার পরিচিত লোকরা বৈদ্যনাথকে বললে—'ডাঃ রায়কে ডেকে আপনার মাকে একবার দেখান। এতে সংকোচের কী আছে!'

ঐ একটি ব্যাপারে বৈদ্যনাথের সত্যিই সংকোচ অপরিসীম। অতবড় ডাক্তার হাতের নাগালে থাকা সত্ত্বেও বৈদ্যনাথ কোনোদিন নিজের পারিবারিক চিকিৎসার জন্য ডাঃ রায়ের কাছে যায়নি। পাড়ার হিতাকাঙ্ক্ষীদের কথায়, খানিকটা মায়ের অনুরোধেও—সে সমস্ত কাগজপত্র ও যাবতীয় প্রেসক্রিপশন নিয়ে রবিবার দুপুরে চলে গেল ডাঃ রায়ের বাড়ি। সেখানে গিয়েই শুনল ডাঃ রায় আজ সেক্রেটারিয়েট-এ গিয়েছেন, জরুরী কাজে। বৈদ্যনাথকে কাল ভোরেই চলে যেতে হবে আসানসোল। সুতরাং আজই, ছুটির দিনেই বিকেলে ডাঃ রায়কে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। বৈদ্যনাথ সোজা চলে গেল রাইটার্স বিল্ডিং। রাইটার্স বিল্ডিং-এ ছুটির দিনেও বৈদ্যনাথ দেখল সারি দিয়ে রয়েছে অনেক গাড়ি। নিচে লিফটের কাছে পুলিস সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে, তার কাছে অনুমতি চাইল দোতালায় উঠে ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করবার।

সার্জেন্ট জানিয়ে দিল আজ ডাঃ রায়ের ঘরে ক্যাবিনেটের জরুরী মিটিং চলেছে, সুতরাং আজ দেখা হবার কোনো উপায় নেই। বৈদ্যনাথ অনেক অনুরোধ উপরোধ জানাল, সার্জেন্ট কিছুতেই রাজী হল না। সে বললে—"আপনার কথায় আপনাকে নিয়ে যাই, আমার চাকরিও যাক।'

বৈদ্যনাথ বিশেষ জোর দিয়েই বললে—'আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আপনার কোনো ক্ষতিই হবে না।'

সার্জেন্ট হেসে বললে—'আপনি কোথাকার লাট সাহেব মশাই যে আপনার কথায় বিশ্বাস করে আপনাকে উপরে নিয়ে যাব !'

বৈদ্যনাথ তখন অনুনয়ের সুরে সার্জেন্টকে বললে—'বেশ আমাকে না-হয় না-ই নিয়ে গেলেন। আমার হাতের এই কাগজ-পত্রগুলি দয়া করে ওঁকে একবার যদি দেখান, তা'হলেই হবে।'

সার্জেন্ট তাতেও গররাজি। সে বলল—'দেখুন, ডাঃ রায় এখন জরুরী ক্যাবিনেট মিটিং-এ বসেছেন। আজই বিকেলের প্লেন-এ যাচ্ছেন দিল্লী। সুতরাং এখন আপনার এই কাগজপত্র দেখবার ফুরসৎ-ই পাবেন না। আপনি পরে আরেকদিন সেক্রেটারির সঙ্গে কথাবার্তা বলে যখন আসতে বলবেন সেই সময় চলে আসুন। জরুরী কাজের সময় আপনার কাগজপত্র নিয়ে ডাঃ রায়ের কাছে হাজির করার দায়িত্ব আমি নিতে পারি না, ও কাজ আমার এক্তিয়ারের মধ্যে নয়।'

বৈদ্যনাথ এবার সত্যিই চিন্তায় পড়ে গেল। ফিরেই যেতে হবে ? হঠাৎ কী মনে করে সার্জেন্টকে বললে—'দেখুন, আমার মায়ের খুবই শঙ্কটাপন্ন অবস্থা। সব ডাক্তাররাই আশা ছেড়ে দিয়েছেন। ওঁর কাছে ছুটে আসার একমাত্র কারণ একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা। আপনি শুধু এই রিপোর্টটা ওঁর হাতে দিন। সময়াভাবে যদি ফেরত পাঠিয়ে দেন, তাতেও আমার মনে কোনো ক্ষোভ থাকবে না। সান্ত্বনা পাব এই ভেবে যে আমার দিক থেকে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি।'

এ কথা শুনে সার্জেন্টের মন নরম হল। বললেন—'দিন আপনার কাগজপত্র। ওঁর হাতে ত দিই, তারপর যা হয় হবে।'

বৈদ্যনাথকে দাঁড় করিয়ে রেখে কাগজপত্রগুলি হাতে করে সার্জেন্ট উপরে চলে গেল।

প্রায় মিনিট কুড়ি পরে সিঁড়ি দিয়ে লাফাতে লাফাতে সার্জেণ্ট নেমে এল। বললে—'আশ্চর্য কাণ্ড মশাই, মিনিস্টারদের সঙ্গে জোর আলোচনা চলছে, তারই মধ্যে সেলাম ঠুকে কাগজটা ওঁর হাতে ধরিয়ে দিলাম। কাগজে আপনার নাম ও আপনার মায়ের নাম দেখেই সব কাজ ও আলোচনা ফেলে অত্যন্ত নিবিষ্ট হয়ে রিপোর্ট পড়লেন, প্রেসক্রিপশনগুলি দেখলেন, তারপর রিপোর্টের পাশে ওঁর মন্তব্য লিখলেন। ততক্ষণ অন্যান্য মিনিস্টাররা সব গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে।'

বৈদ্যনাথ দেখল রিপোর্টের কাগজটার একপাশে খালি জায়গাটায় রুগীর চিকিৎসা সম্পর্কে কি করিতে হবে তার দীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়ে কয়েকটা ইনজেক্শন আর ওযুধের প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়েছেন। সব শেষে ব্যক্তিগতভাবে দুঃখ জানিয়ে বৈদ্যনাথকে লিখেছেন যে, আজই সন্ধ্যা ছ'টায় ওঁকে দিল্লীর প্লেন ধরতে হবে, তাই বৈদ্যনাথের মাকে দেখতে যাওয়া সম্ভব হল না। এই ইনজেকশন ও ওষুধ দিন সাতেক চালাবার পর মা কেমন থাকেন যেন ওঁকে অবশ্যই জানানো হয়। প্রয়োজন হলে তখন নিজে গিয়ে রুগী দেখে আসবেন।

বৈদ্যনাথ কৃতজ্ঞ চিত্তে বাড়ি ফিরে এল। বাড়ির ডাক্তারকে সব বুঝিয়ে দিয়ে সে পরদিন সকালে চলে গেল আসানসোল। পরের শনিবার এসে বৈদ্যনাথ দেখে ওর মা অনেকখানি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। শুধু তাই নয়, বিছানায় উঠে বসে হাসিমুখে নাতিনাতনীর সঙ্গে হাসিমস্করা করছেন। ডাক্তার বললে, রুগীর অবস্থা বেশ ভাল, ক্রমশই আরোগ্যের পথে।

রবিবার সকালে বৈদ্যনাথ চলে গেল ডাঃ রায়ের বাড়ি। দেখা

করতেই ডাঃ রায় নিজেই বললেন—'তোমার মা ত ভালই আছেন মনে হচ্ছে, অন্তত তোমার মুখ তাই বলছে।'

বৈদ্যনাথ বললে—'একটা সুযোগ পেয়েছিলাম আপনাকে আমার বাড়ি নিয়ে যাবার, সে সুযোগও আপনি আমায় দিলেন না।'

ডাঃ রায় হেসে বললেন—'দিলে তুমি খুসি হতে না নিশ্চয়। মা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠুন, তখন যাবো একদিন তোমার বাড়ি। তবে হ্যাঁ, পাড়াশুদ্ধ লোককে আগে থাকতে আবার জানিয়ে রেখো না। তা হলে পালিয়ে আসতে হবে।'

মায়ের জন্য নতুন করে ওষুধপথ্যির ব্যবস্থা লিখে দেবার অনুরোধ জানাতেই ডাঃ রায় বললেন—'আর কোনো ওষুধের দরকার নেই, ইনজেকশনেরও না। আচ্ছা, তোমার বাড়ি থেকে বাওয়ালী মণ্ডলের রাস মন্দিরটা কতদূর?'

'বেশী দূর নয়, সোয়া মাইল পথ হবে।'

'বেশ, তোমার মেয়ে বা বৌমাকে বোলো রোজ বিকেলে ওঁকে হাঁটিয়ে মন্দিরে নিয়ে যেতে। মন্দির দর্শনও হবে, ওখানে শুনেছি রোজ সন্ধ্যায় কথকথা আর কীর্তন গানটান হয় তাও ভক্তিভরে শুনবেন, ঘণ্টাখানেক বাদে আবার ওঁকে হাঁটিয়ে বাড়ি নিয়ে আসবে। ওইটুকু পথ রোজ একবার হেঁটে যাওয়া আসা করলেই ওঁর হজমশক্তি ফিরে পাবেন। ওষুধে আর কাজ নেই।'

ডাঃ রায়ের কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে বৈদ্যনাথ বললে—'আমার ট্রান্সফারের কথাটা আর একবার মনে করিয়ে দিলাম স্যার।'

ডাঃ রায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'তাই তো হে, ও-কথাটা ত আমি বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলাম। এক কাজ করো। টেবিলের উপর ক্যালেণ্ডারটার পাতায় আগামী কালের তারিখে লিখে রাখো।'

বৈদ্যনাথ ডেস্ক ক্যালেণ্ডারে সোমবারের পাতাটা ওল্টাতেই দেখল এনগেজমেন্ট-এ ভর্তি। আরেকটা লাইন লিখবার জায়গা পর্যন্ত নেই। সব শেষে এক চুল পরিমাণ জায়গায় ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে লিখে দিল—Transfer of Baidyanath from Assansol to Calcutta.

এরপরে বেশ কয়েক মাস ডাঃ রায়ের সঙ্গে বৈদ্যনাথের আর দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। নানা রকম কাজের চাপে ছুটির দিনেও ডাঃ রায়কে ব্যস্ত থাকতে হয়, অনেক সময় আপিসের কাজে টুরে যেতে হয় বলে বৈদ্যনাথেরও ছুটির দিনে কলকাতায় আসা সম্ভব হয় না। কিন্তু ডাঃ রায়ের সঙ্গে চিঠিপত্র লেখালেখি নিয়মিতই হয়।

॥ বারো ॥

১৯৬২ সালের জুন মাস। বৈদ্যনাথ আপিসের কাজে বিহার অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাটনায় এসে হঠাৎ সে খবরের কাগজে দেখল ডাঃ রায় অসুস্থ! অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, হার্ট-এর ট্রাবল্। ডাক্তাররা নির্দেশ দিয়েছেন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে!

খবরটা পড়েই বৈদ্যনাথের মনে একটা অমঙ্গলের ছায়া ঘনিয়ে এল। ইলেকশনের সময় ডাঃ রায়কে যে-রকম অমানুষিক পরিশ্রম করতে দেখেছে বৈদ্যনাথ, তখনই তার মনে আশংকা দেখা দিয়েছিল যে এই বয়সে এই ধকল ওঁর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হবে কি না। খবরটা পড়ে আর স্থির থাকতে পারেনি বৈদ্যনাথ। সেদিনই চলে এল আসানসোল।

পরদিন ছিল শনিবার। বিকেলের গাড়িতে কলকাতায় পৌঁছেই হাওড়া স্টেশন থেকে ডাঃ রায়ের বাড়িতে টেলিফোন করে জানতে পারল যে তাঁর অবস্থা আপাতত অনেকটা ভাল, তবে শয্যাশায়ী। ডাক্তাররা বলেছেন পূর্ণ বিশ্রাম নিতে।

পরদিন যথারীতি দুপুরে বৈদ্যনাথ ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্য ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়িতে চলে গেল। শোবার ঘরে পিঠের তলায় দুটো বালিশ দিয়ে শুয়ে আছেন ডাঃ রায়। বিছানার একপাশে একটা টেবিলে এক গাদা ফাইল, তারি একটা টেনে নিয়ে মনোযোগ সহকারে দেখছেন। আসবার সময় নিউ মার্কেট থেকে সাদা গোলাপফুলের একটা তোড়া নিয়ে গিয়েছিল বৈদ্যনাথ। ফুলের গুচ্ছ হাতে বৈদ্যনাথকে ঘরে ঢুকতে দেখেই

ফাইলটা টেবিলের উপর রেখে ডাঃ রায় বললেন—'রোগীর ওষুধ হাতে তুমি এসে গিয়েছ বৈদ্যনাথ, ভালই হয়েছে।'

ফুলদানিতে গোলাপগুচ্ছ সাজিয়ে রেখে ডাঃ রায়ের বিছানার পাশে এসে দাঁড়াতেই ডাঃ রায় বললেন—'চেয়ারটা টেনে এনে আমার কাছে এসে বোসো। এতক্ষণে মন খুলে কথা বলবার লোক পেলাম।'

বৈদ্যনাথ একটা চেয়ার টেনে ডাক্তার রায়ের বিছানার পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল—'আপনার কিন্তু স্যার বেশী কথা বলা নিষেধ। ডাক্তার ব্যানার্জি সেই নির্দেশই সবাইকে দিয়ে গিয়েছেন শুনলাম।'

মৃদু হেসে ডাঃ রায় বললেন—'রামমোহন রায়ের একটা গান মনে পড়ে গেল বৈদ্যনাথ। "মনে করো শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর। অন্যে সবে কথা কবে তুমি রবে নিরুত্তর।" আমার হয়েছে সেই দশা। অন্যে সবে আমার উপর ডাক্তারী ফলাচ্ছে, আমিই রব নিরুত্তর।'

বৈদ্যনাথ বললে—'এতকাল আপনি সকলের উপর ডাক্তারী করেছেন, এবার সকলে সুযোগ পেয়েছে আপনার উপর ডাক্তারী করবার। এখন আর আপনি ডাক্তার নন, রুগী। রুগীকে ডাক্তারের কথা মেনে চলতে হবে বইকি।'

ডাক্তার রায় হেসে বললেন—'কাল পদ্মজাও এসে এই কথাই আমাকে শুনিয়ে গেল। বললে—এতকাল আমরা তোমার কথা শুনে এসেছি, এবার তোমাকে আমাদের কথা শুনতে হবে। আরও বললে—তুমি চীফ মিনিস্টার হতে পার, তবে আমি যে তোমার গভর্নর সেটা ভুলে যেও না। গভর্নেসও বলতে পারো আমাকে, সুতরাং আমার কথা শুনতে তুমি বাধ্য।' বলতে বলতে রোগযন্ত্রণা ভুলে গিয়ে ডাঃ রায় সরবে হেসে উঠলেন।

বৈদ্যনাথ বলল—'উনি ত ঠিক কথাই বলেছেন, কিন্তু আপনি ত দেখছি আপনার দপ্তর নিয়ে এসেছেন বিছানার পাশে।'

ডাঃ রায় কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—'দেখো বৈদ্যনাথ, আমার আরোগ্যের একমাত্র উপায় এই সব কাজ নিয়ে থাকা। স্বপ্ন আমি দেখি না কিন্তু সংকল্প আমার অনেক। তার কিছু পালন করতে পেরেছি, এখনো অনেক বাকি।'

বৈদ্যনাথ বলল—'কিন্তু স্যার, অসুস্থ শরীর নিয়ে আপনার এইসব কাজ এখন না করাই ভালো। সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া দরকার।'

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ডাঃ রায় বললেন—'বিশ্রাম, বিশ্রাম, বিশ্রাম। কানের কাছে সব সময় শুনছি বিশ্রাম নিন, বিশ্রাম নিন। বিশ্রাম ত আমি একদিন নেবই, অনন্তকালের জন্য বিশ্রাম। বোধহয় সে দিনের আর বেশি দেরি নেই। তবে কি জানো? কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে পারলেই আমার মন ভাল থাকে।'

'কিন্তু শরীর তা মানবে কেন।'

ডাঃ রায় হেসে বললেন—'সারা জীবন ধরে বহু রুগী নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি। শুনেছি লোকে নাকি বলে আমি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। আসলে ব্যাপারটা কি জানো? ও-সব কিছু নয়। মানুষের রোগ থাকে মনে, শরীরে নয়। মনটাকে যদি রোগমুক্ত করা যায় শরীরও সুস্থ হয়ে ওঠে। আমার চিকিৎসাবিদ্যার চাবিকাঠি ছিল সেইটিই।'

বৈদ্যনাথ বিস্মিত হয়ে ডাঃ রায়ের কথা শুনছিল, এমন অন্তরঙ্গভাবে কথা বলতে এর আগে কোনোদিন সে দেখেনি। ওঁর পক্ষে এত কথা বলাটাও যে উচিত নয় সেটাও বৈদ্যনাথ জানে। বিদায় নেবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে বৈদ্যনাথ বললে—'আজ আসি

স্যার, আগামী রবিবার আপনার জন্মদিন, সেদিন দুপুরে আবার আসব।'

উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন ডাঃ রায়। বললেন—'ঠিক্ এসো কিন্তু। গত বছর কত লোক এসেছিল, কত আমোদআহ্লাদ। তুমি কিন্তু আসোনি, সে-কথা আমার মনে আছে। এবার আসতেই হবে। আমার জন্মদিনে তোমাদের কাছে পেলে আমার সবচেয়ে বেশি আনন্দ হয়।'

লজ্জিত হয়ে বৈদ্যনাথ বললে—'গত বছর আপিস থেকে আমাকে টুরে পাঠিয়ে ছিল বলে আসতে পারিনি। এবার আর সে-আশঙ্কা নেই। কারণ ২রা জুলাই থেকে আমি হেড আপিসে ট্রান্সফার হয়েছি এবং সেটা আপনারই চেষ্টায় হয়েছে, সে-খবরও আমি জানি।'

খুশী হয়ে উঠলেন ডাঃ রায়। বললেন—'যাক্, অর্ডার এসে গেছে? খুবই আনন্দের কথা। তোমার মা নিশ্চয় সবচেয়ে খুশি হয়েছেন।'

বৈদ্যনাথ বললে—'মা বলেছেন, এবার একদিন আপনাকে আমার বাড়ি নিয়ে যেতেই হবে।'

ডাঃ রায় আস্তে আস্তে বললেন—'যাবো বৈদ্যনাথ, নিশ্চয় যাবো। সেরে উঠেই যাবো। যাবার আগে একটা কাজ করবে বৈদ্যনাথ, পড়ার ঘর থেকে ফার্মাকোপিয়াটা একবার এনে দাও।'

লাইব্রেরী রুম থেকে বই এনে টেবিলের উপর রেখে বৈদ্যনাথ বললে—'আজ আসি স্যার সামনের রবিবার নিশ্চয় আসব।'

পায়ের দিকে টেবিলের ফুলদানিতে রাখা শ্বেত গোলাপগুচ্ছের দিকে ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থেকে ডাঃ রায় বললেন—'নিশ্চয় এসো, আমার জন্ম দিনে তোমার যেন দেখা পাই।'

॥ তেরো ॥

বিশুদা থামলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত এ কাহিনী আমি শুনছিলাম। টেবিলের উপর ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখি বেলা তিনটা বেজে গিয়েছে। কোথা দিয়ে যে এতখানি সময় পার হয়ে গেল টের পাইনি। আপিসে প্রচুর কাজ সে খেয়ালও আমার ছিল না। ভারাক্রান্ত মনে বিশুদা স্তব্ধ হয়ে বসে কী যেন চিন্তা করছেন, আমার মুখেও কোনো কথা নেই! একটা প্রশ্ন বারবার জাগছিল, বৈদ্যনাথের অবস্থা এখন কী।

প্রশ্নটা বিশুদাকে জানাতেই বললেন—'আমিও সেই কথাই ভাবছি। ওর ছেলেমেয়েরা আমায় বললে যে কাল সকালবেলা এগারোটায় স্নান-খাওয়া করে বৈদ্যনাথ বেরিয়েছিল। ডাঃ রায়ের জন্মদিন, নিউ মার্কেট থেকে ফুল কিনে নিয়ে সেখানে যাবে, সে-কথাও সে মাকে বলে গিয়েছিল। বেরোবার সময় বৈদ্যনাথের মেয়ে একটি বেলফুলের গড়ে মালা কলাপাতায় মুড়ে বাবার হাতে দিয়ে বলেছিল দাত্বর গলায় এ মালাটা পরিয়ে দিও বাবা, বোলো আমি নিজের হাতে এ মালা গেঁথেছি। বৈদ্যনাথ সেই যে গেল, এখনও ফেরেনি।'

হঠাৎ বিশুদা খাট থেকে উঠে পড়েই বললেন—'যাই, এতক্ষণে বোধহয় ডাঃ রায়কে শ্মশানে নিয়ে আসা হয়েছে।'

তাড়াতাড়ি রেডিওটা খুললাম। ডাঃ রায়কে শ্মশানে আনা হয়েছে। দাহের পুর্বে কে একজন সংস্কৃতমন্ত্র পাঠ করছেন। হঠাৎ ধপাস করে

খাটের উপর বিশুদা বসে পড়েই বললেন—'আমি অপরাধী। ঘোরতর অপরাধ করেছি সাগরবাবু।'

বিস্মিত হয়ে বললাম—'কেন কী অপরাধ!'

একটা কান্নার আবেগকে চাপবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বিশুদা বললেন—'আমি যে ওদের স্তোক বাক্য দিয়ে ভুলিয়ে এসেছি।'

'কাদের ?'

'বৈদ্যনাথের মা-স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের। আমি বলে এসেছিলাম শোকযাত্রা আসতে দেরী আছে, ততক্ষণ আমি একটু ঘুরে আসছি, এসেই নিয়ে যাবো ডাঃ রায়কে একবার শেষ দেখা দেখাবার জন্যে। ওরা হয়তো এখনো আমার কথায় বিশ্বাস করে বসে আছে।'

বিশুদাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—'তা অবশ্য এখন আর নেই, তবে আপনি না গিয়ে ভালই করেছেন। বৈদ্যনাথের শোকাকুল পরিবারকে নিয়ে ঐ প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে আপনার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হত না।'

বিশুদা বললেন—'বৈদ্যনাথের মা-স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের কান্না যদি দেখতেন সাগরবাবু, অত্যন্ত নিকট আত্মীয় মারা গেলেও বুঝি মানুষ অমন করে কাঁদে না। আসলে আমি তা সহ্য করতে পারিনি বলেই পালিয়ে এসেছি।'

রাস্তায় বেরিয়ে বিশুদা আবার সেই জনারণ্যে মিলিয়ে গেলেন। আপিসে যেতেই হবে, একটা ট্যাক্সির আশায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। বৈদ্যনাথের কথাই বারবার ঘুরে ফিরে মনকে তোলপাড় করছিল। একজন অতি দরিদ্র নগণ্য এক সাধারণ মানুষ, অপরজন বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক অসাধারণ পুরুষ। অথচ দুজনের মধ্যে কোথায় যেন চরিত্রগত এক আশ্চর্য মিল। বৈদ্যনাথ চেয়েছিল সে তার মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দেবে,

একটি স্বচ্ছল সুখী সংসার গড়ে নিজেকে সার্থক করে তুলবে। এইটুকুই ছিল বৈদ্যনাথের আশা আকাঙ্ক্ষা আর সংকল্প। বৈদ্যনাথের সে-আশা পূরণ হয়েছে, সে-আকাঙ্ক্ষা মিটেছে, সে-সঙ্কল্প সে কাজে পরিণত করেছে।

ডাঃ রায়েরও ছিল সেই একই আশা আকাঙ্ক্ষা আর সংকল্প। বঙ্গজননীর চোখের জল তিনিও মুছিয়ে দিতে চেয়েছিলেন; বাংলাদেশ ছিল তাঁর সংসার। সেই সংসারকে স্বচ্ছল সুখী করে গড়ে তোলাই ছিল তাঁর আশা আকাঙ্ক্ষা আর সংকল্প।